আয়াতুল কুরসী ও তাওহীদের প্রমাণ

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ আব্দুর রায্যাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল-বদর

অনুবাদ : আবদুর রাকীব (মাদানী)

সম্পাদনা : আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011-1432

IslamHouse.com

﴿ آية الكرسي وبراهين التوحيد ﴾

« باللغة البنغالية »

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

ترجمة: عبد الرقيب رضاء الكريم

مراجعة: أبو بكر محمد زكريا

2011-1432

IslamHouse.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা সুউচ্চ সুমহান এবং একচ্ছত্র উচ্চতার অধিকারী আল্লাহর জন্য যিনি, মহত্ব, মহিমা এবং অহংকারের মালিক। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। পূর্ণাঙ্গ বিশেষণসমূহে তিনি একক। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মদ তাঁর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর উপর এবং তাঁর সহচরবৃন্দ ও পরিবার পরিজনের প্রতি বর্ষিত হউক দরূদ-রহমত এবং শান্তি।

অতপর: কুরআন মজীদের সর্বমহান আয়াত 'আয়াতুল কুরসী' এবং তাতে উল্লেখিত মহৎ, স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল দলীল প্রমাণসমূহের সম্পর্কে এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা ও আলোচনা যা, মহত্ত্ব, বড়ত্ব এবং পূর্ণতার ব্যাপারে মহান আল্লাহর একত্বের প্রমাণ বহন করে এবং বর্ণনা করে যে, তিনি আল্লাহ পবিত্র। তিনি ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই। নেই কোন সত্য উপাস্য। তাঁর নাম বরকত পূর্ণ। মহান তাঁর মহিমা। তিনি ছাড়া নেই কোন মা'বুদ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন: (আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও ঘুম তাঁকে স্পর্শ করে না, আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তারই; এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনের ও পেছনের সবকিছুর ব্যাপারে তিনি অবগত। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি আছে এবং এসবের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।) [আল বাকারাহ/২৫৫]

[আয়াতুল কুরসীর মহাত্ম]

এই বরকতপূর্ণ আয়াতটির বড় মহাত্ম এবং উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। কারণ মাহাত্ম, সম্মান এবং মর্যাদার বিবেচনায় কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের মধ্যে এটি সর্বমহান, সর্বোত্তম এবং সুউচ্চ আয়াত। এর চেয়ে সুমহান আয়াত কুরআনে আর নেই। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটিকে সর্বোত্তম বলেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর স্বীয় সহীহ গ্রন্থে উবাই বিন কা‘আব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল তাঁকে বলেন: “হে আবূল মুনযির! তোমার নিকট কিতাবুল্লাহর কোন

আয়াতটি সর্বমহান? আমি বলি : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বেশি জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় আবার সেই প্রশ্নটি করেন। তারপর আমি বলি: (আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যূল কাইয়্যূম)। তারপর রাসূলুল্লাহ্ আমার বক্ষে হাতের থাবা মেরে বলেন: আল্লাহর কসম! “লি ইয়াহ্নিকাল্ ইলমা আবাল মুনযির” [সহীহ মুসলিম/৮১০] অর্থাৎ এই জ্ঞানের কারণে তোমাকে ধন্যবাদ! যা, আল্লাহ তোমাকে দান করেছে, তোমার জন্য সহজ করেছে এবং তা দ্বারা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে আল্লাহর কসম খেয়েছেন। বিষয়টির মর্যাদ এবং সম্মান প্রকাশার্থে।

উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সুন্দর বুদ্ধি-মত্তা দেখুন! যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই প্রশ্নটি করেন, তিনি ঐ আয়াতটি খোঁজ করেন যাতে কেবলমাত্র, কুরআনের সর্বোচ্চ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হল, তাওহীদ, তাওহীদের প্রমাণসমূহ সাব্যস্তকরণ, রবের মাহাত্ম্য ও ও পূর্ণাঙ্গতার বর্ণনা এবং তিনিই কেবল বান্দাদের ইবাদতের হকদার। এটি তার পূর্ণ জ্ঞান এবং সুন্দর বুদ্ধির পরিচয়। তিনি এমন কোন আয়াতের উল্লেখ করেন নি যাতে বর্ণনা হয়েছে

প্রশংসিত ব্যবহার কিংবা ফেকহী বিধি-বিধান কিংবা পূর্ব উম্মতের ঘটনা কিংবা কিয়ামতের ভয়াবহতা বা অনুরূপ কোন বিষয়। বরং তিনি নির্বাচন করেন তাওহীদের ঐ আয়াত, যাতে কেবল তাওহীদের বর্ণনা হয়েছে এবং তাওহীদকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এই গভীর জ্ঞানকে অনুধাবন করার জন্য একটু চিন্তা করুন। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু দশ-বিশটি আয়াতের মধ্য থেকে এই আয়াতকে নির্বাচন করেন নি, আর না একশত-দুইশত আয়াতের মধ্য থেকে, বরং ছয় হাজারেরও বেশী আয়াত থেকে নির্বাচন করেছেন। কেমনি না করেন! কারণ তিনি হলেন "কারীদের প্রধান... রাসূলুল্লাহর জীবিত থাকাবস্থাতেই তিনি কুরআনকে একত্রিত করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি পেশ করেন এবং তাঁর থেকে বরকতপূর্ণ ইলম সংরক্ষণ করেন। তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ইলম ও আমলে প্রধান"। [যাহাবী, সিয়ারু আলামিন্ নুবালা-১/৩৯০]

তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানের মধ্যে এটিও যা, বুখারী এবং মুসলিম আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, একদা আল্লাহর রাসূল উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন: "আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যেন আমি তোমাকে কুরআন পড়ে

শুনাই। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: সত্যিই কি আল্লাহ আপনার কাছে আমার নাম নিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ বলেনঃ হ্যাঁ, আমার কাছে তোমার নাম ধরে বলা হয়েছে। উবাই এটি শুনে (খুশিতে) কেঁদে ফেলেন।”

আপনি আরও একটু চিন্তা করুন! যেন তাঁর গভীর জ্ঞান জানতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁকে কোন লম্বা সময় যেমন এক সপ্তাহ বা এক মাস লাগেনি, যাতে করে তিনি এর মধ্যে আয়াতগুলি ভাল করে পড়ে নেন, মানের ব্যাপারে চিন্তা করেন। বরং তিনি রাসূলুল্লাহ্র দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার পরে, সেই সময়েই উত্তর দেন। তিনি এই বরকতময় আয়াতটিকে নির্বাচন করেন।

এটি একটি এমন আয়াত যাতে, তাওহীদের তিন প্রকারের সংক্ষিপ্ত পাঠ, লাভজনক প্রামাণিকতা এবং ভাল বর্ণনা রয়েছে। তাওহীদের সাব্যস্ততা এবং বর্ণনা একত্রিত হয়েছে যা, একসাথে অন্য কোন আয়াতে একত্রিত হয়নি বরং একাধিক আয়াতে পৃথক পৃথক ভাবে এসেছে। শাইখ আব্দুর রহমান আস্ সা‘দী (রহঃ) বলেন: “এই আয়াত তাওহীদে উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ, আসমা ওয়াস্ সিফাত এবং তাঁর বিশাল রাজত্ব, বিস্তৃত বাদশাহি, অনন্ত জ্ঞান, মহিমা, মর্যদা, মহত্ব, অহঙ্কার, এবং তামাম সৃষ্টির থেকে

তিনি উর্দ্ধে, এসবের অর্ন্তভূক্ত। এই আয়াতটি আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ এবং গুণাবলীর আকীদার সম্পর্কে মূল আয়াত। সমস্ত সুন্দর নাম এবং সুউচ্চ গুণাবলীকে সামিল”। [তাফসীরে সা‘দী পৃ: ১১০]

হ্যাঁ! এই আয়াতটি নির্বাচন করার ক্ষেত্রে উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সিদ্ধান্ত অবশ্যই গভীর এবং সুক্ষ্ম যা, সাহাবাদের অন্তরে তাওহীদের মাহাত্ম্যের প্রমাণ। এটি সেই বর্ণনার অনুরূপ যা, ইমাম বুখারী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এক সারিয়্যায় (এমন অভিযান যাতে রাসূলুল্লাহ্ উপস্থিত থাকতেন না) পাঠান। তিনি সাথীদের নামায পড়ানোর সময় (কুল হুআল্লাহু আহাদ) দ্বারা নামায সমাপ্ত করতেন। ফিরে আসলে রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খবর দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তাকে জিজ্ঞাসা করো কেন সে এরকম করত। সে উত্তরে বলে: কারণ তাতে আল্লাহুর গুণের বর্ণনা আছে। আর আমি তা পড়তে ভালবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “সুসংবাদ দাও যে, তাকে আল্লাহ অবশ্যই ভালবাসে”।

সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত সূরাটি বারবার এবং সর্বদা পড়ার কারণস্বরূপ বলেন: তাতে আল্লাহর গুণ বর্ণনা হয়েছে। এ বিষয়টি সাহাবাদের পূর্ণ জ্ঞান এবং তাদের অন্তরে তাওহীদের মাহাত্ম্য প্রমাণ করে।

শায়খুল ইসলাম বলেন: " আর এটা দাবী করে যে, যে আয়াতে আল্লাহর গুণ বর্ণনা হয়েছে তা পাঠ করা মুস্তাহাব। আল্লাহ এটা পছন্দ করেন। আর যে এটা পছন্দ করে তাকেও আল্লাহ ভালবাসেন"। [আল্ ফাতাওয়া আলকুবরা ৫/৭]

যেহেতু তাওহীদের মরতবা সর্বোচ্চ সেহেতু সে বিষয়ের আয়াতটিও সর্বমহান এবং সে বিষয়ের সূরাগুলিও সর্বোত্তম সূরা। কুরআনের আয়াত এবং সূরা সমূহের , এক অপরের প্রতি মর্যাদা, বাক্যাদি এবং অর্থের কারণে, বাক্যালাপকারীর কারণে নয়। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন: "এটা জানা কথা যে কুরআন এবং আল্লাহর অন্য কালামের একটি অপরটির উপর প্রাধান্যতা, বর্ণনাকারীর সাথে সংযুক্তের কারণে নয়; কারণ তিনি তো এক সত্ত্বাই, বরং যে কালেমাসমূহ দ্বারা বাণী সংঘটিত হয় সেগুলোর অর্থের কারণে হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে সে শব্দাবলীর দিক থেকে যেগুলো এর অর্থের প্রকাশক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে সঠিক সুত্রে প্রমাণিত, তিনি সূরাসমূহের মধ্যে সূরা ফাতিহাকে প্রাধান্য দেন এবং বলেন: “ না তাওরাতে, না ইন্‌জিলে, আর না কুরআনে তার মত অবতীর্ণ হয়েছে।” [তিরমিযী নং ২৮৭৫] .... এবং আয়াতসমূহের মধ্যে আয়াতুল কুরসীকে প্রাধান্য দেন। সহীহ হাদীসে এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই বিন কা‘বকে জিজ্ঞাসা করেন: “ তোমার কাছে কুরআন মজীদের কোন আয়াতটি সর্ব মহান? সে বলে: (আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা হুআল্‌ হাইয়্যূল কাইয়্যূম) তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ নিজ হাত দ্বারা তার বক্ষে আঘাত করে বলেন: আবুল মুনযির! এই ইলমের কারণে তোমাকে ধন্যবাদ”।

আয়াতুল কুরসীতে যা বর্ণিত হয়েছে তা. কুরআনের অন্য কোন একটি আয়াতে হয় নি। বরং আল্লাহ তা‘আলা সূরা হাদীদের শুরুতে এবং সূরা হাশরের শেষে একাধিক আয়াতে তা বর্ণনা করেন, একটি আয়াতে নয়। [জাওয়াবু আহ্‌লিল ইল্‌ম.... ১৩৩]

ইব্‌নুল কাইয়েম (রহঃ) বলেন, “এটা জানা বিষয় যে, তাঁর সেই কালাম যাতে তিনি নিজের প্রশংসা করেন এবং নিজের গুণ ও একত্ব বর্ণনা করেন তা, উত্তম সেই কালাম থেকে যা দ্বারা তিনি তাঁর শত্রুদের তিনস্কার করেন এবং তাদের মন্দ গুণের বর্ণনা

করেন। এ কারণে সূরা ‘ইখলাস’ উত্তম সূরা ‘তাব্বাত’ থেকে। তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশ, অন্য কোন সূরা নয়। আর আয়াতুল্ কুরসী কুরআনের মহৎ আয়াত” ।[শেফাউল্ আলীল ২/৭৪৪]

[রাসূলুল্লাহ্ উম্মতকে আয়াতুল কুরসী পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন]

আয়াতুল কুরসীর মাহাত্ম্যের কারণে সুন্নতে তা বেশি বেশি পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে, প্রতিদিন পঠিতব্য দো‘আর মধ্যে রাখতে বলা হয়েছে যার প্রতি মুসলিম ব্যক্তি যত্নবান হবে এবং দিনে বারংবার পড়বে:

১-হাদীসে প্রতি নামায শেষে আয়াতুল কুরসী পড়তে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম নাসাঈ আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল বলেছেন: “যে ব্যক্তি প্রতি ফরয নামায শেষে আয়াতুল কুরসী পড়ে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া কোন কিছু বাধা হবে না। [আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্ লায়লা নং ১০০, সাহীহ আল্ জামে গ্রন্থে শাইখ আলবানী সহীহ্ বলেন নং ৬৪৬৪]

ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) বলেন, “আমাদের শাইখ আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়াহ-কাদ্দাসাল্লাহু রূহাহু-থেকে জানা গেছে, তিনি

বলেন: প্রতি নামায শেষে আমি তা পাঠ করা ছাড়ি নি” [যাদুল মা‘আদ ১/৩০৪]

২- ঘুমাবার সময় পাঠ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ব্যক্তি বিছানায় আশ্রয় নেয়ার সময় তা পাঠ করবে, আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্যে এক রক্ষক নির্ধারণ করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটে আসবে না। সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: “একদা রাসূলুল্লাহ্ আমাকে রমযানের যাকাতের হেফাযতে নিযুক্ত করেন। রাতে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি আসে এবং হাত ভরে ভরে যাকাতের খাদ্য দ্রব্য চুরি করে। আমি তাকে গ্রেফতার করি এবং বলি: আল্লাহর কসম! তোমাকে রসুলুল্লাহর নিকট পেশ করবো। সে বলে: আমি দরিদ্র আমার সন্তান-সন্ততি আছে। আমি খুব অভাবী। দুঃখ্ শুনে আমি তাকে ছেড়ে দেই। সকাল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন: আবু হুরাইরা! গত রাতে তোমার বন্দী কি করেছিল? আমি উত্তরে বলি: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে আমার কাছে দুঃখ-দুস্থতার কথা বলে, ছেলে পেলের কথা বলে। আমার মায়া চলে আসে, আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সে মিথ্যা বলেছে

এবং সে আবার আসবে। আমার বিশ্বাস হয়ে যায় সে অবশ্যই আসবে কারণ রাসূলুল্লাহ্ পুনরায় আসার কথা বললেন। আমি তাক লাগিয়ে থাকি। রাতে আবার হাত ভরে ভরে যাকাতের খাদ্য চুরি করে। আমি তাকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করতে চাইলে, সে বলে: ছেড়ে দাও ভাই! আমি দুঃখি মানুষ, বাড়িতে আমার সন্তান-সন্ততি আছে, আমি আর আসব না। কথা শুনে তার প্রতি আমার রহম হয়। আমি ছেড়ে দেই। সকালে আল্লাহর রাসূল বলেন: আবূ হুরাইরাহ তোমার কয়দীর খবর কি? আমি উত্তরে বলি: আল্লাহর রাসূল সে তার দুঃখের কথা বলে, ছোট ছোট বাচ্চার কথা বলে, শুনে আমার রহম চলে আসে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় থাকি। আবার চুরি। পাকড়ও করে বলি, এবার অবশ্যই রাসূলুল্লাহর নিকট পেশ করব। এটা শেষ তৃতীয়বার। তুমি বলো: আর আসবে না, আবার আস। সে বলে আমাকে ছেড়ে দাও। বিনিময়ে তোমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দেব। আল্লাহ তা দ্বারা তোমার উপকার করবে। আমি বলি সেগুলি কি? সে বলে: যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা

হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম) শেষ আয়াত পর্যন্ত। এ রকম করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বক্ষণের জন্য এক রক্ষক নির্ধারণ করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসবে না। এর পর আমি তাকে ছেড়ে দেই। সকালে আল্লাহ্‌র রাসূল আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন: গত রাতে তোমার বন্দী কি করেছে? আমি বলি: সে আমাকে এমন কিছু কথা শিক্ষা দিতে চায় যার দ্বারা আল্লাহু আমার উপকার করবে। আমি তাকে ছেড়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্‌ বলেন: সেই কথাগুলি কি? আমি বলি: সে আমাকে বলে: ঘুমানোর উদ্দেশ্যে যখন বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুআল হাইয়্যুল কাইয়্যুম) সে বলে: এরকম করলে, তোমার হেফাযতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বক্ষণের জন্য এক রক্ষক নির্ধারণ করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তি হবে না। - বর্ণনাকারী বলেন: সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন- সবকিছু শুনার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সে আসলে মিথ্যুক কিন্তু তোমাকে সত্য বলেছে। আবুহুরায়রা ! তুমি কি জান, তিন দিন ধরে তুমি কার সাথে কথোপকথন করছিলে? সে বলে: না। রাসূলুল্লাহ্‌ বলেন: ও ছিল শয়তান। [সহীহ বুখারী নং ২৩১১]

৩- সকালে সন্ধায় যিকর-আযকার করার সময় পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। উবাই ইবনে কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তাঁর এক খেজুর রাখার থলি ছিল। ক্রমশ খেজুর কমতে থাকত। একরাতে সে পাহারা দেয়। হঠাৎ যুবকের মত যেন এক জন্তু! তিনি তাকে সালাম করেন। সে সালামের উত্তর দেয় । তিনি বলেন: তুমি কি ? জিন না মানুষ? সে বলে: জিন। উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: তোমার হাত দেখি। সে তার হাত দেয়। তার হাত ছিল কুকুরের হাতের মত আর চুল ছিল কুকুরের চুলের মত। তিনি বলেন: এটা জিনের সুরত। সে (জন্তু) বলে: জিন সম্প্রদায়ের সাথে আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। তিনি বলেন: তোমার আসার কারণ কি? সে বলে: আমরা শুনেছি আপনি সাদকা পছন্দ করেন, তাই কিছু সাদকার খাদ্যসামগ্রী নিতে এসেছি। সাহাবী বলেন: তোমাদের থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? সে বলে: সূরা বাকারার এই আয়াতটি (আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুআল হাইয়্যুল কাইয়্যুম)। যে ব্যক্তি সন্ধায় এটি পড়বে, সকাল পর্যন্ত আমাদের থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর যে ব্যক্তি সকালে এটি পড়বে, সন্ধা পর্যন্ত আমাদের থেকে নিরাপদে থাকবে। সকাল হলে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে আসেন এবং ঘটনার খবর দেন। রাসূলুল্লাহ্ বলেন: খবীস সত্য বলেছে” । হাদীসটি নাসাঈ এবং

ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন। [শাইখ আলবানী সহীহুত্ তারগীবে সহীহ বলেন ১/৪১৮]

[আয়াতুল কুরসী শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রাখে]

এটি এবং এর পূর্বে বর্ণিত দলীলটি বান্দার রক্ষার বাপারে এই আয়াতের ক্ষমতা, কোন স্থান হতে শয়তান বিতাড়িত করা এবং শয়তানের ষড়যন্ত্র এবং অনিষ্টতা হতে নিরাপদে থাকা প্রমাণ করে। আর যদি তা শয়তানী অবস্থাস্থলে পড়া হয় তাহলে তা বাতেল করে দেয়। যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইব্নে তাইমিয়া তাঁর বইসমূহের বিভিন্ন স্থানে প্রমাণ করেছেন। তিনি 'আল ফুরকান' নামক বইয়ে বলেন: "সত্যতার সাথে যদি আয়াতূল কুরসী সে সময় পড়া হয় তাহলে, তা রহিত হয়ে যায়, কারণ তাওহীদ শয়তানকে তাড়ায়।" [আল্ ফুরকান বায়না আউলিয়াইর্ রাহমান ওয়া আউলিয়াইশ্ শায়ত্বান, পৃ ১৪৬]

তিনি আরো বলেন: "মানুষ যদি শয়তানী চক্রান্তাস্থানে সত্যতার সাথে আয়াতুল কুরসী পড়ে, তাহলে তা (জাদু-মন্ত্র) নষ্ট করে দেয়" [আল্ ফুরকান, ১৪০]

তিনি ‘কায়েদাহ জালীলাহ ফিত্ তাওয়াস্সুল ওয়াল ওসীলা’ নামক গ্রন্থে আরো বলেন: “আয়াতুল কুরসী সত্যতার সাথে পড়তে হবে, পড়বে এটি গায়েব হয়ে যাবে নচেৎ যমীনের ভিতরে ঢুকে যাবে আর না হলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।” [কায়েদাহ জালীলাহ /২৮]

তিনি আরো বলেন: “ঈমানদার এবং মুওয়াহ্হীদ ব্যক্তিদের প্রতি শয়তানের কোন প্রভাব নেই, সে কারণে তারা সেই ঘর থেকে পালায় সে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয়। অনুরূপ আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষাংশ এবং অন্যান্য কুরআনের করাঘাতকারী আয়াত পড়লেও পালায়। জিনদের মধ্যে কিছু জিন এমন আছে যারা জ্যোতিষীদের এবং অন্যদের ভবিষ্যদ্বাণী করে, তারা সেটাই শোনায় যা তারা আকাশ থেকে (ফেরেশতাদের আলোচনার অংশ) চুরি করে শুনে নিয়েছিল। আরব ভূমিতে জ্যোতিষীর বহুল প্রচলন ছিল। তারপর যখন তাওহীদ প্রচার হয়, শয়তান পলায়ন করে। শয়তানী দুর হয় কিংবা হ্রাস পায়। এরপর এটি সেই সব স্থানে প্রকাশ পায় যেখানে তাওহীদের প্রভাব ক্ষীণ”। [আন্ নাবুওয়াত ১/২৮০]

তিনি আরো বলেন: “এই সমস্ত শয়তানী চক্রান্ত বানচাল হয় বা দুর্বল হয় যখন, আল্লাহ এবং তাঁর তাওহীদের স্মরণ করা হয়

এবং করাঘাতকারী কুরআনের আয়াত পাঠ করা হয়। বিশেষ করে আয়াতুল কুরসী; কারণ তা সমস্ত অস্বাভাবিক শয়তানী যড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়”। [নাবুওয়াত, ১/২৮৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা আয়াতুল কুরসী বেশী বেশী পড়তে উদ্বুদ্ধকরণ, মুসলিম ব্যক্তির জন্যে তা এবং তাতে উল্লেখিত তাওহীদ এবং মাহাত্ম্যের অতি প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। যার সামনে কোন বাতেল টিকে থাকতে পারে না। বরং তা বাতেলের স্তম্ভ ধ্বংস করে দেয়, বুনিয়াদ নড়বড়ে করে দেয়, ঐক্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়, মূলোৎপাটন করে দেয় এবং তার আসল ও আলামত মুছে দেয়।

পূর্বোল্লেখিত দলীলসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, দিন-রাতে এই আয়াতটি আটবার পড়া মুস্তাহাব। সকাল সন্ধায় দুইবার। ঘুমাবার সময় একবার। ফরজ নামায শেষে পাঁচবার। মুসলিম ব্যক্তি যখন এটি বারবার পড়তে সক্ষম হবে, অর্থ ও চাহিদার দিক সামনে রেখে এবং পরিণাম ও উদ্দেশ্যের চিন্তার সাথে, তখন তার অন্তরে তাওহীদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাবে, তার মনে তাওহীদের বন্ধন দৃঢ় হবে, হৃদয়ে তাওহীদের অঙ্গিকার শক্ত হবে। এভাবে সে হয়ে

যাবে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধারণকারী যা কখনও ছিন্ন হওয়ার নয়। যেমন আয়াতুল কুরসীর পরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

[আয়াতুল কুরসী পড়ার উদ্দেশ্য]

উদ্দেশ্য, অর্থ স্মরণ ব্যতীত শুধু পড়া নয়। আর না শুধু তেলাওয়াত, ভাবার্থ না জেনে। আল্লাহ যদি সমগ্র কুরআনের সম্পর্কে এটি বলেন যে: (তারা কেন কুরআনের প্রতি মনসংযোগ করে না? (নিসা: ৮২) তাহলে সে আয়াতের মরতবা কি হবে যা সম্পূর্ণরূপে সর্ববৃহৎ ও সর্বমহান। আর তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী? তাই যদি পঠনের সময় অর্থের চিন্তা-ভাবনা না থাকে, তাহলে প্রভাব কম হবে এবং উপকারও অল্প হবে। ইতোপূর্বে শায়খূল ইসলামের উক্তি বর্ণিত হয়েছে: "যদি তা সত্যতার সাথে পড়ে" । তার কথায় এ কথাটি বারংবার উল্লেখ হয়েছে। যা দ্বারা জ্ঞাত করা হয়েছে যে, শুধু পাঠ করা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে যথেষ্ট নয়। দুই জনের মধ্যে কত বড় পার্থক্য! একজন সে যে গাফেল মনে পড়ে। আর একজন সে যে এর মহৎ এবং বরকতপূর্ণ অর্থ আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করে, এ সবের চিন্তা ভাবনার সাথে পড়ে। ফলে তার অন্তর তাওহীদে পরিপূর্ণ হয় এবং ঈমান ও আল্লাহর মর্যাদা তার আত্মায় আবাদ হয়।

আয়াতুল কুরসী, এইরূপ বারবার গভীরভাবে মনযোগ সহকারে পড়ার গুরুত্বপূর্ণ মহা উপকারিতা রয়েছে, যা থেকে অনেকে বেখেয়াল। তা হচ্ছে তাওহীদ ও তার রুকনসমূহের স্মরনের গুরুত্ব এবং তাওহীদের বুনিয়াদ অন্তরে গভীরকরণ ও তাতে তার সীমা বৃদ্ধিকরনের গুরুত্ব। এটা ওদের বিপরীত যারা তাওহীদের বিষয় এবং তাওহীদের চর্চা তুচ্ছ মনে করে এবং মনে করে যে, এটির শিক্ষা মানুষ কয়েক মিনিটে ও কয়েক সেকেন্ডে অর্জন করতে পারে, ধারাবাহিক ও স্থায়ী চর্চা ও স্মরণের কোন প্রয়োজন নেই।

[আয়াতুল কুরসীর সংক্ষিপ্ত বিষয়াদি]

এই মর্যাদা সম্পন্ন মুবারক আয়াতটি দশটি বাক্য দ্বারা গঠিত। এতে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর সম্মান, মাহাত্ম্য এবং পূর্ণাঙ্গতা ও মহানুভবতার ক্ষেত্রে তাঁর একত্বের বর্ণনা হয়েছে যা, এর পাঠকারীর রক্ষা ও যথেষ্টতা সত্যায়িত করে। এতে আল্লাহ তা‘আলার সুন্দর নামসমুহের পাঁচটি নাম আছে। কুড়িটিরও অধিক গুণের উল্লেখ আছে। উপাসনা বা ইবাদতের ব্যাপারে তাঁর একত্বের বর্ণনা এবং তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য বাতিল, এর উল্লেখ দ্বারা আয়াত শুরু করা হয়েছে। তারপর আল্লাহর পূর্ণ

জীবনের বর্ণনা করা হয়েছে যার ধ্বংস নেই। তারপর তাঁর পবিত্র কাইয়ুমিয়্যাত তথা সবকিছুর ধারক (নিজের ও সৃষ্টির যাবতীয় পরিকল্পনার ধারক) এটি বর্ণিত হয়েছে। অত:পর অক্ষম গুণাবলী হতে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে যেমন তন্দ্রা এবং ঘুম। অত:পর তাঁর প্রশস্ত রাজত্বের বর্ণনা হয়েছে। বলা হয়েছে: ভুমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর দাস, তাঁর সার্বভৌমত্বে ও তাঁর অধীনে। তাঁর মহানতার প্রমানস্বরূপ বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির কেউই তাঁর আদেশ ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারবে না। এতে মহান আল্লাহর জ্ঞানের গুণের প্রমাণ এসেছে। তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টিত। তিনি জানেন অতীতে যা হয়েছে, ভবিষ্যতে যা হবে এবং যা হয়নি, যদি হত, তো কেমন হত। এতে আল্লাহ সুবহানাহুর মহানতার বর্ণনা হয়েছে তাঁর সৃষ্টিসমূহের বড়ত্বের বর্ণনার মাধ্যমে। কারণ কুরসী যেটি সৃষ্টিজগতের মধ্যে একটি সৃষ্টি যা , আকাশ ও যমীনকে পরিব্যপ্ত করে আছে। তাহলে সম্মানীয় স্রষ্টা এবং মহান প্রভূ কত মহান হতে পারেন! এতে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা হয়েছে। তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার পরিচয় এই যে, আকাশ এবং যমীনের সংরক্ষণে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না। অতঃপর দুটি মহান নামের উল্লেখের মাধ্যমে আয়াতের সমাপ্তি করা হয়েছে।

সে দুটি নাম হচ্ছে: ‘আল্ আ’লিইউ’ সর্বোচ্চ, ‘আল্ আযীম’ সর্বমহান। এই দুটি নাম দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার সত্তা, ক্ষমতা এবং বিজয়ের সাথে উর্দ্ধতার প্রমাণ হয়। তাঁর মহত্বের প্রমাণ হয় এ বিশ্বাসের মাধ্যমে যে, সর্বপ্রকার মাহাত্ম্য এবং মর্যাদার মালিক কেবল তিনি। তিনি ব্যতীত আর কেউই সম্মান, বড়াই এবং মর্যাদার হকদার নয়।

এই হচ্ছে আয়াতুল কুরসীর সংক্ষিপ্ত বিষয়াদি। এটি একটি মহান আয়াত। এতে আছে মহান অর্থ, গভীর অর্থের দলীল-প্রমাণাদি এবং ঈমানী জ্ঞানসমূহ যা, এই আয়াতের শ্রেষ্ঠত্য এবং সুমর্যাদা প্রমাণ করে।

মুহতারাম শাইখ আল্লামা আব্দুর রহমান ইবন সা‘দী (রহ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন: “এ মর্যাদাসম্পন্ন আয়াতটি কুরআন মজীদের সর্বমহান এবং সর্বোত্তম আয়াত। কারণ এতে বর্ণিত হয়েছে মহৎ বিষয়াদী এবং মহান গুণাবলী। আর এ কারণেই বহু হাদীসে এটি পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং মানুষকে সকাল-সন্ধা, ঘুমানোর সময় এবং ফরয নামাযসমূহের পর পড়তে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা নিজ সম্পর্কে বলেন: (লা ইলাহা ইল্লা হুআ) অর্থাৎ তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তাহলে তিনিই সত্য মাবুদ যার জন্যে নির্ধারিত হবে সমস্ত প্রকারের ইবাদত, আনুগত্য এবং উপাসনা। তাঁর অগনন করূনার কারণে এবং এই কারণে যে, দাসকে তাঁর প্রভূর দাস হওয়া মানায়। তাঁর আদেশাদি পালন করা এবং নিষেধাদি থেকে বিরত থাকা মানায়। তিনি ব্যতীত সব মিথ্যা। তাই তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত মিথ্যা। কারণ তিনি ছাড়া সব সৃষ্টি, অক্ষম, পরিকল্পিত, মুখাপেক্ষী সর্বক্ষেত্রে। তিনি ব্যতীত কেউই কোন প্রকার ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নয়।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী (আল্ হাইউল কাইয়ূম): ‘চিরঞ্জীব ও সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী’ এই দুটি সম্মানীয় নাম কোন না কোনরূপে সমস্ত সুন্দর নামাবলীর প্রমাণ করে। যেমন ‘হাই’: তথা চিরঞ্জীব, আর ‘হাই’ তো সেই সত্তাই হতে পারেন, যিনি পূর্ণ জীবনের অধিকারী, সত্তার সমস্ত গুণকে আবশ্যককারী। যেমন শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, ক্ষমতা ইত্যাদি। (আল্ কাইয়্যূম) অর্থাৎ: নিজের ধারক এবং অপরের ধারক। এটি তাঁর সমস্ত কর্ম প্রমাণ করে যে, সমস্ত কর্মের গুণে তিনি গুণান্বিত যা তিনি চান। যেমন আরশের উপর উঠা, অবতরণ করা, বাক্যালাপ করা, বলা, সৃষ্টি করা, রুযী দেওয়া, মৃত্যু দেওয়া, জীবিত করা এবং সব প্রকারের পরিকল্পনা

করা। এসব কার্যাদি কাইয়ূম শব্দের সাথে সংযুক্ত। একারণে কিছু গবেষক বলেছেন: উপরোক্ত নাম দুটি ইসমে আযম (মহান নাম) যার দ্বারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে তিনি কবুল করেন এবং চাইলে তিনি দান করেন।

তাঁর পূর্ণ জীবন এবং পূর্ণ ধারক হওয়ার স্বরূপ এই যে, (তাঁকে সেনা বা তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না) আয়াতে বর্ণিত সেনা অর্থ: তন্দ্রা।

(লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল্ আর্দ) আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁর মালিকানাধীন'। অর্থাৎ তিনি প্রভূ, তিনি ছাড়া অন্য সব দাস। তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা পরিকল্পনাকারী , আর বাকী সব সৃষ্টি, রূযী গ্রহণকারী, পরিকল্পিত, আকাশ এবং যমীনে অনূ পরিমাণেরও কোন কিছুর না নিজে মালিক না অপরের মালিক।

একারণে আল্লাহ বলেন: (কে আছে যে, তাঁর কাছে সুপারিশ করবে তাঁর আদেশ ছাড়া?) অর্থাৎ: তাঁর আদেশ ব্যতীত তাঁর কাছে কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। সমস্ত সুপারিশের মালিক তিনি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি রহম

করতে চাইবেন, আদেশ করবেন তাকে, যাকে আল্লাহ সম্মান দিতে চাইবেন, যেন সে সেই বান্দার জন্য সুপারিশ করে। তার পরেও সুপারিশকারী আল্লাহর আদেশের পূর্বে সুপারিশ শুরু করবে না।

তার পরে আল্লাহ বলেন: (তিনি অবগত যা তাদের সম্মুখে আছে) অর্থাৎ অতীতের সমস্ত বিষয়। (এবং পশ্চাতে যা আছে) অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা কিছু হবে। সব বিষয়ের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান পূংখানুপূংখরূপে পরিবেষ্টিত। আগের ও পরের, প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য, উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সব কিছু। বান্দারা এ সবের মালিক না আর না অনু পরিমাণ কোন ইলমের মালিক। কিন্তু আল্লাহ যতটুকু তাদের শিক্ষা দেন।

এ কারণে আল্লাহ বলেন: (তাঁর জ্ঞান ভান্ডার হতে তারা কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।) এটি তাঁর মাহাত্মের পূর্ণাঙ্গতা এবং রাজত্বের ব্যাপকতা প্রমাণ করে। আর এটা যদি কুরসীর অবস্থা হয় যা, মহান আকাশ এবং যমীন এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত বৃহৎ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করতে সক্ষম, অথচ কুরসী আল্লাহুর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি নয়। বরং এর অপেক্ষা বড় সৃষ্টি আছে আর তা হচ্ছে 'আরশ' যা কেবল আল্লাহ জানেন।

এই সৃষ্টিগুলোর বড়ত্বতা সম্পর্কে চিন্তা করলে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, পাহাড় কম্পিত হয় এবং বীরপুরুষ কাপুরুষ হয়ে পড়ে। তাহলে তিনি কত মহান যিনি এ সবের সৃষ্টিকর্তা, আবিষ্কারক! যিনি এতে রেখেছেন কত তত্ত্ব কত রহস্য! যিনি আকাশ এবং যমীনকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করেন বিনা কোন কষ্টে বিনা শ্রান্তে।

এই কারণে আল্লাহ বলেন: (ওয়ালা ইয়া উদুহু) অর্থাৎ বিনা শ্রান্তে। (উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করেন)।

আর (তিনি সর্বোচ্চ) তাঁর সত্তায় তিনি আরশের উপর, ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি সমস্ত সৃষ্টির উপর, অনুরূপভাবে মর্যাদার দিক থেকেও তিনি সবার উপরে, তাঁর গুণাসমুহের পূর্ণাঙ্গতার কারণে।

(আল্ আযীম) সর্বাপেক্ষা মহান। যাঁর মহানতার কাছে অত্যাচারীর অত্যাচার দুর্বল। যাঁর মর্যাদার সামনে শক্তিশালী বাদশাহদের মর্যাদা ক্ষীণ। পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁরই যিনি মহান মাহাত্বের মালিক, পূর্ণ অহংকারের মালিক এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতি জয়-বিজয়ের মালিক।” [তাফসীর সা‘দী পৃ: ১১০]

ইব্‌নে কাসীর রাহেমাহুল্লাহ তাঁর তফসীরে বলেন: " এই আয়াতে (আয়াতুল কুরসী) দশটি বাক্য আছে.." । তারপর তিনি সে গুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু করেন। এই মুবারক আয়াতটির ব্যাখ্যা এবং নির্ভূল প্রমাণাদি জানার জন্যে এর তাফসীর এবং অন্যান্য তাফসীরের বই পাঠ করা ভালো হবে।

এই বরকতপূর্ণ আয়াতের প্রমাণাদিকে কেন্দ্র করে নিম্নে তাওহীদের দলীলসমূহ এবং মহৎ সহায়ক বিষয়াদির কিছু বর্ণনা দেয়া হল: তাওহীদ সাব্যস্ত করণার্থে এবং তাওহীদের সহায়ক বিষয়াদী বর্ণনার্থে।

[আয়াতটির শুরু কথা]

এই বরকতপূর্ণ আয়াতটি চিরন্তন তাওহীদের বাক্য দ্বারা প্রারাম্ভ করা হয়েছে (মহান আল্লাহ তিনিই যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) এটি একটি মহান বাক্য। বরং সর্বাপেক্ষা মহান বাক্য। যার কারণে আকাশ-যমীন দণ্ডায়মান। যার কারণে সৃষ্টি হয় সমস্ত সৃষ্টি হয় । যাকে প্রতিষ্টিত করার জন্যে রাসূলদের প্রেরণ করা হয়েছিল এবং আসমান হতে কিতাবসমূহ অবতরণ করা হয়েছিল। যার কারণে নেকী-বদীর পরিমাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমল নামা রাখা

হয়েছে এবং জান্নাত-জাহান্নাম নির্মিত হয়েছে। এর কারণেই আল্লাহর বান্দা মুমিন এবং কাফেরে বিভক্ত হয়েছে। যার প্রতিষ্ঠিত করণের উদ্দেশ্যে কিবলা নির্মিত হয়েছে এবং মিল্লাতের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এটি আল্লাহ তা'আলার হক সমস্ত বান্দাদের প্রতি। ইসলামের কালেমা এবং জান্নাত তথা শান্তির বাসস্থানের চাবি। এটি তাক্কওয়ার কালেমা এবং সুদৃঢ় হাতল। এটি ইখলাসের কালেমা এবং হক্কের সাক্ষী, হক্কের আহবান এবং শিরক হতে মুক্তির ডাক। এটি সর্বোত্তম নেয়ামত এবং উৎকৃষ্ট উপহার ও মিনতি। [কালেমাতুল ইখলাস, ইবনু রাজাব পৃ: ৫৩]

কিয়ামত দিবসে এই কালেমার সম্পর্কে পূর্বের ও পরের লোকদের জিজ্ঞাসা করা হবে। আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহর সম্মুখে অতক্ষনে নড়া-চড়া করতে পারেনা যতক্ষণে না দুটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। একটি হচ্ছে, তোমরা কার ইবাদত করতে? অপরটি হচ্ছে, নবী-রাসূলদের আহবানে তোমরা কতখানি সাড়া দিয়েছিলে?

প্রথমটির উত্তর: কালেমায়ে তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাহ'কে জেনে, স্বীকার করে এবং বাস্তবে আমল করার মাধ্যমে উহা প্রতিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয়টির উত্তর: 'অবশ্যই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'। এই

সাক্ষ্য ভালভাবে জেনে, স্বীকৃতি দান করে এবং আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে উহা বাস্তবায়ন করা।

[কালেমার উদ্দেশ্য শুধু মুখে উচ্চারণ করা নয়]

এই কালেমার ফযীলত এবং ইসলামে এর গুরুত্ব, বর্ণনাকারীর বর্ণনা এবং জ্ঞানীদের জ্ঞানের উর্দ্ধে। বরং এর ফযীলত এবং গুরুত্ব এত বেশী যা, মানুষের মনে এবং অন্তরেও খটকেনা। তবে মুসলিম ব্যক্তিকে এই স্থানে একটি বড় এবং মহৎ বিষয় জানা উচিৎ যা, এই বিষয়ের মগজ এবং আসল। আর তা হচ্ছে এই যে, এই কালেমার কিছু মানে-মতলব আছে যা, বুঝা জরূরী। কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে যা, আয়ত্ব করা প্রয়োজন। জ্ঞানীদের সর্বসম্মতে এই কালেমার মানে না বুঝে, শুধু মুখে উচ্চারণে কোন লাভ নেই। আর না আমলে লাভ আছে উহার দাবী-দাবা না পূরণে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন: (আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না কিন্তু যারা জেনে বুঝে সত্যের সাক্ষ্যপ্রদানকারী) [যুখরূফ/৮৬]

আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বলেন: অর্থাৎ: কিন্তু যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাক্ষ্য দেয়। মুখে যা বলে, অন্তরে তা বিশ্বাস

করে। কারণ সাক্ষ্যর দাবী হচ্ছে, যার সাক্ষী দেয়া হচ্ছে তার সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা। অজ্ঞতা বিষয়ে সাক্ষ্য হয় না। অনুরূপ সাক্ষ্যর দাবী হচ্ছে সত্যতা এবং এটির বাস্তবায়ন। বুঝা গেল, এই কালেমার সম্পর্কে আমল ও সত্যতার সাথে সাথে জ্ঞান জরূরী। জ্ঞানের দ্বারাই বান্দা খৃষ্টানদের রীতি-নীতি থেকে পরিত্রান পেতে পারে যারা, না জেনে আমল করে। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ ইয়াহূদীদের চরিত্র থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে যারা, জানে তবে আমল করে না। জ্ঞানের দ্বারাই বান্দা মুনাফেকদের চরিত্র থেকে নাজাত পায় যারা, অন্তরে যা আছে, প্রকাশ করে তার বিপরীত। এরপর বান্দা আল্লাহর সরল পথ অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। যাদের প্রতি গযব বর্ষণ করেন নি এবং তারা পথভ্রষ্টও নয়।

সারকথা, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য ও লাভজনক হবে যে ব্যক্তি এ কালেমার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক অর্থের জ্ঞান রাখে এবং তা বিশ্বাস করে ও আমল করে। আর যে যবানে বলে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমল করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না সে মুনাফিক। আর যে মুখে বলে তবে তার বিপরীত শির্ক করে সে কাফের। অনুরূপ যে মুখে বলেছে কিন্তু এর কোন

জরুরী বিষয় এবং দাবীসমুহের কোন কিছু অস্বীকার করার কারণে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে. তাহলে সে কালেমা তার কোন লাভ দেবে না যদিও সে হাজার বার তা পাঠ করে। অনুরূপ যে তা মুখে বলে অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্যে কোন প্রকার ইবাদত করে, তারও কোন লাভ দিবে না। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দো'আ-প্রার্থনা করা, যবেহ করা, মান্নত করা, ফরিয়াদ করা, ভরসা করা, দুঃখ কষ্টের সময় প্রত্যাবর্তন করা, আশা-আকাংখা করা, ভয় করা এবং ভালবাসা ইত্যাদি। তাই যে ব্যক্তি ইবাদতের মধ্য হতে কোন কিছু অন্যের জন্য করল যা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য অসমীচীন, তাহলে সে মহান আল্লাহর সাথে শরীক করল। যদিও সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে থাকে। কারণ এই কালেমা, তাওহীদ ও ইখলাসের যে দাবী রাখে সে অনুযায়ী সে আমল করল না যা, প্রকৃত পক্ষে এই মহান কালেমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। [তায়সীরুল আযীযিল্ হামীদ পৃ: ৭৮]

কারণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'এর অর্থ হচ্ছে: কোন সত্য উপাস্য নেই একজন ব্যতীত তিনি হচ্ছেন এক আল্লাহ যার, কোন অংশী নেই।' ইলাহ' অভিধানিক অর্থে উপাস্য কে বলা হয়। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য

নেই। যেমন আল্লাহ বলেন: (আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর) [আম্বিয়া/২৫] এর সাথে আল্লাহর এই বাণী ও (অবশ্যই আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি যেন, তারা কেবল আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগুত বর্জন করে।) [আন্ নাহল/৩৬] এ দ্বারা স্পষ্ট হল যে, 'ইলাহ' এর অর্থ মাবুদ (উপাস্য) এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ কেবল এক আল্লাহর জন্যই ইবাদত সুনিশ্চিত করা এবং তাগুতের (আল্লাহ বিরোধী সমস্ত অপশক্তি) ইবাদত থেকে বিরত থাকা। এ কারণে কুরাইশের কাফেরদের যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলতে বলেন, তখন তারা বলে: (সে কি বহু মাবুদের পরিবর্তে এক মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক আশ্চার্য ব্যাপার!) [ছোয়াদ/৫]

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলতে বললে হুদ নবীর কাওম তাঁকে বলে: (তুমি কি আমাদের নিকট শুধু এই উদ্দেশ্যে এসেছো, যেন আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে বর্জন করি?) [আরাফ/৭০]

তারা এটি তখন বলে যখন তাদের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এর দিকে আহবান করা হয়; কারণ তারা জানতে পারে যে, এর অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত উপাসনার অস্বীকার এবং তা কেবল এক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করণ যার, কোন শরীক নেই। তাই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমায় দুটি বিষয় পরিলক্ষিত। একটি না বাচক আর একটি হাঁ বাচক। না বাচক হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনার অস্বীকার। তাই আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু, ফেরেশ্‌তাবর্গ হোক বা নবীগণ, তারা উপাস্য নয়। তাদের কোন উপাসনা হতে পারে না। এ ছাড়া অন্যরা তো আরও যোগ্য নয়। হাঁ বাচক হচ্ছে, শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ইবাদত সুনিশ্চিত করণ। বান্দা তিনি ছাড়া শরনাপন্ন হবে না। উহা হচ্ছে বাধ্য করে। যেমন দুআ-প্রার্থনা, কুরবানী এবং নযর-মান্নত ইত্যাদী।

কুরআনে কারীমে অনেক প্রমাণ আছে যা, তাওহীদের কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ প্রকাশ করে এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করে। তন্মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার বাণী (এবং তোমাদের মাবুদ একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্ব প্রদাতা করূণাময় ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই।) [আল্ বাকারাহ/১৬৩] এবং তাঁর বাণী (তারা তো আদিষ্ট

হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।) [আল্‌ বাইয়্যিনাহ/৫]

এবং তাঁর বাণী (স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আ) তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্যে যাতে তারা (শির্ক থেকে) প্রত্যাবর্তন করে।) [যুখরুফ/২৬-২৮]

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইয়াসীনে মুমিন বান্দার ঘটনা বর্ণনায় বলেন: (আমার কি হয়েছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করবো না? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য মাবুদ গ্রহণ করবো? দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। এরুপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো।) [ইয়াসীন/২২-২৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন: (বল: আমি আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্য একনিষ্ট হয়ে তাঁর এবাদত করতে। আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই। বল: আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির। বল: আমি ইবাদত করি আল্লাহরই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ থেকে।) [যুমার/১১-১৪] আল্লাহ তা‘আলা ফেরাউনের পরিবারের মুমিন লোকদের ঘটনা বর্ণানা করত: বলেন: (হে আমার কাওম, ব্যাপার কি. আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহকে আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে আহবান কর, ইহকালে ও পরকালে তার কোন দাওয়াত নেই! আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী।) [গাফির/ ৪১-৪৩]

এ মর্মের প্রচুর আয়াত আছে যা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ বিশ্লেষণ করে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কথিত শরীক ও সুপারিশকারীর ইবাদত থেকে মুক্ত হওয়া এবং কেবলমাত্র এক আল্লাহর জন্য ইবাদত করা। এটাই হচ্ছে উত্তম তরীকা এবং সত্য দ্বীন যার কারণে আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন । শুধু বুলিস্বরূপ মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, অর্থ না বুঝা, দাবী অনুযায়ী আমল না করা, হয়তবা: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্যেও ইবাদতের কিছূ অংশ করা, যেমন প্রার্থনা করা, ভয় করা, কুরবাণী দেয়া, নযর-মান্নাত ইত্যাদী করা। এরূপ করলে বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ওয়ালার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আর না কেয়ামতের দিনে এটি বান্দাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে। [তাইসীরূল আযীযিল্ হামীদ, ১৪০]

তাই জেনে রাখা ভাল যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' শুধু একটি বিশেষ্য নয় যে, যার কোন অর্থ নেই। আর না শুধু একটি বাক্য যার কোন সত্যতা নেই। আর না একটি শব্দ যার কোন মর্ম নেই। যেমন অনেকের ধারণা। যারা বিশ্বাস করে যে এই কালেমার আসল রহস্য হচ্ছে শুধু মুখে বলা, অন্তরে কোন প্রকার অর্থের বিশ্বাস

ছাড়াই। কিংবা শুধু মুখে উচ্চারণ করা কোন প্রকারের বুনিয়াদ বা ভিত্তি স্থাপন ছাড়াই। এটা কখনও এই মহান কালেমার মর্যাদা নয়। বরং এটি একটি এমন বিশেষ্য যার আছে মহৎ অর্থ। একটি এমন শব্দ যার আছে উত্তম বিশ্লেষণ যা, সমস্ত বিশ্লেষণ হতে উৎকৃষ্ট। যার মূল কথা, আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কিছুর উপাসনা হতে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা এবং এক আল্লাহর উপাসনার দিকে মনযোগ দেওয়া, বিনয়-নম্রতার সাথে, লোভ-লালসার সাথে, আশা-ভরসার সাথে এবং দু'আপ্রার্থনার সাথে। তাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ওয়ালা কারো নিকট চাইবে না কিন্তু আল্লাহর কাছে, কারো কাছে ফরিয়াদ জানাবে না কিন্তু আল্লাহুর দরবারে, ভরসা করবে না কারো উপর কিন্তু আল্লাহর প্রতি, আশা করবে না আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে, কুরবানী- নযরানা পেশ করবে না কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আর না সে ইবাদতের কোন অংশ গায়রুল্লাহর জন্যে করবে। সে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা অস্বীকার করবে এবং এ থেকে আল্লাহর কাছে বিচ্ছেদের ঘোষণা জানাবে।

এটি অবগত হওয়ার পর জানা প্রয়োজন যে, আয়াতুল কুরসীতে তাওহীদের উজ্জ্বল দলীলসমূহ এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, ইবাদতের হকদার কেবল তিনি।

তিনি আল্লাহ একক সবার উপর বিজয়ী। এই আয়াত উক্ত দলীলসমূহ পরস্পর ক্রমানুসারে একের পর এক এসেছে এমনি ভাবে তাওহীদের এই দলীলমানা এবং অন্যান্য ছন্দ পূর্ণ হয়েছে।

সংক্ষিপ্তাকারে এই প্রমাণাদির নিম্নে বর্ণনা দেয়া হল:

প্রথম প্রমাণ: ﴿ٱلْحَيُّ﴾ (আল্ হাইউ) চিরঞ্জীব

আল্লাহ তা'আলাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে এক জানার সম্পর্কে এটি স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি পবিত্র চিরঞ্জীবের গুণে গুণান্বিত, পূর্ণ জীবনের অধীকারী, অনাদি, যাঁর ধ্বংস এবং পতন নেই, মন্দ এবং ক্রটি মুক্ত, মহামান্বিত, প্রবিত্র আমাদের রব্ব। এটি এমন জীবন যা আল্লাহর পূর্ণ গুণসমূহকে অবশ্য করে। এরকম গুণের অধীকারীই ইবাদত, রুকু এবং সিজদা পাওয়ার হকদার। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: (তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই।) [আল্ ফুরকান/৫৮]

আর সেই জীবিত যার মৃত্যু আছে কিংবা মৃত যে জীবিত না কিংবা জড়পদার্থ আসলে যার জীবন নেই, এই রকম কোন কিছুই কোন

প্রকারের ইবাদতের যোগ্য না। ইবাদতের যোগ্য তো তিনিই যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই।

দ্বিতীয় প্রমাণ : ﴿ٱلۡقَيُّومُ﴾ (আল্ ক্বাইয়্যূম)

অর্থাৎ: নিজের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী। এই নামের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে তাঁর সমস্ত কার্যের গুণাবলী এবং অবগত করায় আমদের তাঁর পূর্ণ অমুখাপেক্ষীর। তাই তিনি নিজের ধারক এবং সৃষ্টির অমুখাপেক্ষী। যেমন আল্লাহ বলেন: (হে মানব সকল ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।) [ফাতির/ ১৫]

অন্যত্রে হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, “হে আমার বান্দারা ! তোমরা কখনই আমার লাভে উপনীত হতে পার না যে, আমার উপকার করবে, আর না আমার ক্ষতিতে উপনীত হতে সক্ষম যে, আমার ক্ষতি করবে”। সৃষ্টি হতে আল্লাহ সুবহানাহুর অমুখাপেক্ষীতা সত্তাগত অমুখাপেক্ষী, কোন বিষয়েই তিনি সৃষ্টির প্রয়োজন মনে করেন না। সব ক্ষেত্রে তিনি তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী।

অনুরূপ এই নামটি সৃষ্টি সমূহের সম্পর্কে আমাদের তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা এবংর্ তাঁর পরিকল্পনা হতে অবগত করায়। তিনি তাঁর ক্ষমতার মাধ্যমে তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। চোখের পলক পড়া বরাবরও তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। আরশ, কুরসী, আকাশসমূহ, যমীন, পর্বতরাজী, গাছ-পালা, মানুষ এবং জীব-জন্তু সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ বলেন: (তবে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে তার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি এদের অক্ষম উপাস্যগুলির মত?) [রা'আদ/৩৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: (আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।) [ফাতির/৪১]

তিনি আরো বলেন: (হে মানব সাম্প্রদায় ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।) [ফাতির/১৫]

তিনি আরো বলেন: (তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি।) [রূম/২৫] এই অর্থের প্রচুর

আয়াত বর্ণিত হয়েছে যে, অর্থ বহন করে যে, তিনিই সমগ্র সৃষ্টির এবং সমগ্র জাহানের পরিচালক এবং পরিকল্পনাকারী।

এ দ্বারা জানা যায় যে, সমস্ত কার্য সম্পর্কীয় আল্লাহর গুণাগুণ যেমন সৃষ্টি করা, রূযী দেওয়া, পুরস্কৃত করা, জীবিত করা, মৃত্যু দেওয়া প্রভৃতি এই নামের (ক্বাইয়ূম) দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। কারণ এটির অর্থ স্বরূপ এই যে, সৃষ্টি করা, আহারদাতা, জীবিত করা, মৃত্যুদাতা এবং পরিচালনা করা রূপে তিনি সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী। যেমন তাঁর সত্তাগত গুনাগুন, উদাহরনস্বরূপ: শ্রবণ, দর্শন, হাথ, জ্ঞান প্রভৃতি তাঁর নাম ‘হায়’ (চিরঞ্জীব) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়: সমস্ত সুন্দর নামাবলীর উৎস এই দুটি নাম (আল্ হায়আল্ ক্বাইয়ূম) একারণে ইসলামী মনিষীদের একদল এই দুটি নামকে ইসমে আযম বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যাকে, মাধ্যম করে বা যার অসীলা দিয়ে দু‘আ করলে দু‘আ কবুল করা হয়, প্রার্থনা করলে প্রার্থনা গ্রহণ করা হয়। আর উভয়ের মর্যাদার কারনে এটি তাওহীদের প্রমাণাদি এবং দলীলাদির গুরুত্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাই যার শান-মর্যাদা এই যে, তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন, ধারক সৃষ্টির পরিচালক, কোন কিছুই তাঁকে পরাস্ত করতে পারে না।

আর না কোন কিছুর অস্তিত্ব হতে পারে তাঁর আদেশ ছাড়া। এরকম গুণের অধিকারীই তো ইবাদতের যোগ্য। অন্য কেউ না। আর তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত ভ্রষ্ট কারণ; তিনি ব্যতীত অন্য, হয় জড় পদার্থ যার, আসলে জীবন নেই, আর না হলে জীবিত ছিল মারা গেছে, কিংবা জীবিত অচিরেই মারা যাবে। আর না কোন সৃষ্টির হাতে জগতের পরিচালনা ও পরিকল্পনার ক্ষমতা আছে বরং রাজত্ব ও পরিচালনা সব কিছু এক আল্লাহর হাতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো খেজুরের আঁটির আবরনেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে আহবান করলে তারা তোমাদের আহবান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছো তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞাত ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না) [ফাতির/১৩-১৪]

তিনি আরো বলেন: (বল: তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মাবুদ মনে কর তাদেরকে আহবান কর; করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করবার অথবা পরিবর্তন করবার শক্তি নেই।) [ইসরা/৫৬]

এবং তিনি বলেন: (আর তারা তাঁর পরিবর্তে মাবুদ রূপে গ্রহণ করেছে অপরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করবার ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখেনা।)[ফুরক্বান/৩]

এরকম দুর্বল-অক্ষমদের জন্য কেমনে ইবাদত করা যায়!

তৃতীয় প্রমাণ:

﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾

(তাঁকে না তন্দ্রা আর না ঘুম স্পর্শ করে)

তন্দ্রা বলা হয় ঘুমের পূর্বাবস্থার ঘুম ঘুম ভাবকে। আর ঘুম তো সবার জানা। আল্লাহ তা'আলা উভয় থেকে পবিত্র, কারণ তিনি পুর্ণ জীবন এবং পূর্ণ রক্ষকের অধিকারী। পক্ষান্তরে মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবিত তবে মরণশীল। তাদের জীবনে প্রয়োজন হয় আরাম-বিরামের। কারণ তারা ক্লান্ত-ব্যথিত হয়। আর ঘুমের কারণেই হচ্ছে ক্লান্ত ও শ্রান্ত বোধ করা। তাই মানুষ ক্লান্তের পর ঘুম নিলে আরাম এবং শান্তি পায়। বুঝা গেল, মানুষ তার দুর্বলতা এবং অক্ষমতার কারণে ঘুমের মুখাপেক্ষী। সে ঘুমায়, তন্দ্রা নেয়,

ক্লান্ত হয়, শ্রান্ত হয় এবং অসুস্থ হয়। এরকম যার অবস্থা তার জন্যে কেমনে ইবাদত করা হবে?

এই তথ্য হতে একটি কায়েদাহ (নিয়ম) স্পষ্ট হয় যে, কুরআনে আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে যা কিছু অস্বীকার করা হয়, তা দ্বারা মহান আল্লাহর পূর্ণতা প্রমান হয়। এ স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘুম ও তন্দ্রা অস্বীকার করা হয়েছে, তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন, তদারকি, ক্ষমতা এবং শক্তির কারণে। আর এ সব কিছুই ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁকে জরুরিভাবে একক করা ও জানার প্রমাণাদি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: ‘আল্লাহ তা‘আলা ঘুমায়না, আর না ঘুম তাঁকে শোভা পায়। তিনি (নেকী-বদীর) পরিমাপ নীচু করেন এবং উঁচু করেন। রাতের আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের আমল রাতের পূর্বে তাঁর নিকট উঠান হয়। তাঁর পর্দা জ্যোতি, যদি তা প্রকট করে দেন, তাহলে তাঁর মহীমা সমস্ত সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছা্রখার করে দিবে”। [মুসলিম. নং ১৭৯] তিনি সুমহান বরকতপূর্ণ।

চতুর্থ প্রমান: ﴿لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ﴾

অর্থাৎ আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক তিনি।

তিনি ব্যতীত আকাশ এবং যমীনের কোন কিছুর কেউই মালিক নয়। অণু পরিমাণেরও মালিক নয়। যেমন আল্লাহ বলেন: (তুমি বল: তোমরা আহবান করা তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বুদ মনে করতে। তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণূ পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং উভয়ের মধ্যে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তার সহায়কও নয়।) [সাবা/ ২২]

অর্থাৎ: অণূ পরিমাণের মালিক নয়, না তো স্বতন্ত্রভাবে আর না অংশী হিসাবে। ইহ জীবনে মানুষ ততটুকুরই মালিক যতোটুকু আল্লাহ তাকে মালিক করেন। আল্লাহ বলেন : (তুমি বল: হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়োপরি ক্ষমতাবান।) [আল্ ইমরান/২৬]

অতঃপর মানুষ ইহ জীবনে যা কিছুর মালিক তার পরিণাম দুয়ের একটি। মৃত্যুকালে হয় তাকে সম্পদ ছেড়ে চলে যেতে হবে আর না হলে সম্পদই তাকে ছেড়ে বসবে, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা অনুরূপ কোন কারণে। সেই বাগান মালীদের ন্যায় যারা প্রভাতে ফলআহরণের কসম খায় এবং ইনশাআল্লাহ বলে না। অতঃপর সেই রাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দুর্যোগ হানা দেয়। ফলে বাগান পুরে ছাই হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন ! সন্ধাকালে দামী বাগানের মালিক আর প্রভাতকালে নিঃস্ব। তাই মনে রাখা দরকার: বান্দা যা কিছুর মালিক তা আল্লাহর পক্ষ্ হতেই। তিনি দানকারী, বঞ্চিতকারী, সঙ্কীর্ণকারী, প্রশস্তকারী, নিম্নকারী, উর্ধ্বকারী, সম্মান দাতা এবং লাঞ্ছিতকারী। আদেশ তাঁরই। রাজত্ব তাঁরই। তাই তিনিই ইবাদতের হকদার। কারণ তার হাতে আছে দেওয়া, না দেওয়া, সম্মান এবং অপমান। তিনি ব্যতীত কেউই কোন প্রকার ইবাদতের হকদার না। বরং তারা সৃষ্টি বাধ্য এবং স্রষ্টার অধীনস্ত।

যে এই জগতের মালিক নয়। অণু পরিমাণেরও স্বতন্ত্রভাবে মালিক নয়। তাহলে তার উদ্দেশ্যে ইবাদতের হকদার তো তিনি যিনি এই জগতের মহিমান্বিত বাদশাহ, সম্মানিত স্রষ্টা, পরিচালক প্রভু যার কোন অংশী নেই।

পঞ্চম প্রমাণ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ ﴾

(কে আছে যে, তাঁর সম্মুখে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে?)

অর্থাৎ: তার অনুমতি ব্যতীত কেউই সুপারিশ করতে পারবে না। কারণ তিনি রাজা। আর তাঁর রাজত্বে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কিছু করতেও পারে না।

(সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ইখিতিয়ারে।)[যুমার/৪৪] তাই উহার আবেদন করা যাবে না তাঁর আদেশ ছাড়া। আর না উহা দ্বারা ধন্য হওয়া যাবে তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া। (যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না।) [সাবা/২৩],আকাশসমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে! তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।) [নাজম/২৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের দিনে, মাকামে মাহমূদ নামক স্থানে সুাপারিশ করার মর্যাদা লাভ করবেন। তিনি নিজে আরম্ভ করবেন না যতক্ষণে আল্লাহর পক্ষ্য হতে আদেশ না হবে। রাসূলুল্লাহ্কে বলা হবে, “মাথা উঠাও এবং

আবেদন কর, আবেদন গ্রহণ করা হবে। সুপারিশ কর, সুপারিশ কবুল করা হবে”।

অতঃপর জানা দরকার যে, সুপারিশকারীর সুপারিশ সবই লাভ করবে না।। বরং তা কেবল মুআহহিদ ও মুখলিসদের জন্য নির্দিষ্ট, মুশরিকদের তাতে কোন অংশ নেই। সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করি: হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামতের দিনে আপনার সুপারিশের কে বেশি সৌভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ্ বলেন: “হে আবূ হুরাইরাহ ! তোমার পূর্বে এ হাদীসের প্রতি লিপ্সার পরিচয়। কেয়ামতের দিনে আমার আমার সুপারিমের সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান সে যে , খাঁটি অন্তরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে”।

ইবনুল কাইয়েম (রহ) বলেন: ‘আবূ হুরাইরার হাদীসে রাসূলুল্লাহ্র বাণী: “আমার সুপারিশের সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে” এটি তাওহীদের একটি রহস্য। আর তা হল, সুপারিশ পাবে সে যে, শুধু আল্লাহর জন্যই ইবাদতকে মুক্ত করবে। যার তাওহীদ পূর্ণ হবে সেই শাফা‘আতের

বেশী হকদার হবে। এমন নয় যে শিরককারীও সুপারিশ লাভ করবে। যেমন মুশরিকদের ধারণা"। [তাহ্যীবুস্ সুনান্, ৭/১৩৪]

মুসলিম শরীফে আবূ হুরাইয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আরো বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ বলেন: "প্রত্যেক নবীর একটি গৃহীত দু'আ আছে। প্রত্যেকেই তা অগ্রিম করেন। আর আমি আমার দু'আকে কেয়ামতের দিনে সুপারিশ স্বরূপ আমার উম্মতের জন্যে গোপন রেখেছি। আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন প্রকার শির্ক না করে মৃত্যু বরণ করবে সে, ইনশাআল্লাহ তা পাবে"।

আল্লাহর প্রাপ্য অন্যকে দেয়ার ব্যাপারে মুশরিকদের যে বিশ্বাস, এ প্রমাণে তা বাতিল করা হয়েছে। তাদের ধারণা, এ সকল (উপাস্য) সুপারিশকারী এবং মধ্যম স্বরূপ। এরা তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। আল্লাহ বলেন: (আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহেরও ইবাদত করে যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে: এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।) [ইউনুস/১৮]

তারা আরো বলে: (আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।) [যুমার/৩]

এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই ইবাদত, মৃত. পাথর. গাছ-পালা এবং অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে করা হয়। তাদের নিকট দু'আ করা হয় এবং কুরবানী ও মান্নত করা হয়। প্রয়োজন পূরণ, বিপদ দুরীকরণ এবং বালা-মসীবত থেকে পরিত্রানের প্রার্থনা করা হয়। তাদের বিশ্বাস, তারা তাদের আহবান শোনে, দু'আ কবুল করে এবং চাহিদা পূরণ করে। এ সবই শির্ক ও ভ্রষ্টতা। প্রাচীন প্রাচীন যুগে ও বর্তমানে সুপারিশের নামে তারা এর অনুশীলন করে আসছে। জানা দরকার, শাফা'আতের তিনটি অধ্যায় আছে যা, ভ্রষ্ট দল জানে না আর নাহলে না জানার ভান করছে। তা হল: আল্লাহর আদেশ ব্যতীত কোন সুপারিশ হবে না। তারই জন্যে সুপারিশ হবে যার কর্ম ও কথা থেকে আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ সুবহানহু তাওহীদবাদী না হলে কারও প্রতি সন্তুষ্ট হন না।

ষষ্ঠ প্রমাণ: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾

(তাদের সামনের ও পেছনের সব কিছুই তিনি জানেন।)

অর্থাৎ: তাঁর জ্ঞান অতীত ও ভবিষ্যতের সব কিছুতে অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি জানেন যা অতীতে হয়েছে এবং যা ভবিষতে হবে। তাঁর জ্ঞান সবাকিছুকে বেষ্টন করে আছে। তিনি সব কিছুর বিস্তারিত হিসাবে রেখেছেন। আর কেমনে বা তাঁর জ্ঞান সব সৃষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত না হয় ! অথচ তিনি সৃষ্টিকর্তা।(যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদশী, সম্যক অবগত।) [আল্ মুলক/১৪]

সৃষ্টির সৃষ্টিকরণ এবং তাদের অস্তিত্বে আনয়নে এ কথার দলীল যে, তাঁর জ্ঞান এ সব কিছুতে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমানে, এ গুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।) [ত্বালাক্ব/১২]

"কথিত আছে, একদা এক নাস্তিক বলে: আমি সৃষ্টি করতে পারি। তাকে তার সৃষ্টি দেখাতে বলা হল। সে কিছু মাংস নেয় এবং ছোট ছোট করে কাটে। তার মাঝে গোবর পুরে দেয়। তার পরে কৌটায়

ভরে ছিপি এঁটে দেয় এবং এক ব্যক্তিকে দেওয়া হয় যে, তিন ধরে তা তার কাছে রাখে। অতঃপর সে আসে। ছিপি খোলা হয়। দেখা গেল কৌটা পোকায় ভর্তি। এবার নাস্তিক বললো : এই দেখ আমার সৃষ্টি !! ঘটনা ক্ষেত্রে উপস্থিত এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো: আচ্ছা এ সবের সংখ্যা কত? তুমি কি এদের খাদ্য দান কর? কোনোটিরও উত্তর দিতে পারে না। এবার নাস্তিককে বলা হল: স্রষ্টা সে যে সৃষ্টির পুংখানুপুংখ হিসাব রাখেন, পুরুষ ও স্ত্রী চেনেন, সৃষ্টিসমূহকে খাদ্য দান করেন এবং তাদের জীবনের সময়সীমা এবং বয়সের শেষ সীমা জানেন। নাস্তিক হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে"। [আল্ হুজ্জাহ ফী বায়ানিল্ মাহাজ্জাহ্, তায়মী, ১/১৩০]

আমার মনে আছে, আমি এই ঘটনাটি ইসলামী গণতন্ত্র দেশসমূহের কোন এক দেশের এক ছাত্রের নিকট বর্ণনা করি। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, যখন সে উত্তর শ্রবণ করে এবং বলে: এ মহান প্রতিউত্তরটি কিভাবে আমাদের মাঝ হতে লুক্কায়িত! সে বলে: কমিউনিষ্টরা ক্লাসে এ সংশয় বর্ণনা করত। বিশেষ করে প্রাইমারী পর্যায়ের ছাত্রদের মাঝে। ফলে মুসলিম ছাত্রদের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হত। সেই ছাত্র বলে: আমার সামনে

এরকম ঘটে। সে এ উত্তরটি বড় নজরে দেখে এবং মহান মনে করে।

যাই হোক, মহান আল্লাহ, তাওহীদকে তাঁরই জন্যে জরূরীকরণের প্রমাণ এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে দ্বীনকে খাঁটি করণ থেকে পূত-পবিত্র। তিনি সুবহানাহু সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা পরিব্যপ্ত করে রেখেছেন এবং তাঁর জ্ঞান সমগ্র জগতকে অন্তর্ভুক্ত। (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণূ পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু) [সাবা/ ৩]. এ কারণে আল্লাহ তা'আলা মুশরেকদের আক্বীদার খন্ডন করত: বলেন: (তারা আল্লাহর বহু শরীক করেছে, তুমি বল: তোমরা তাদের পরিচয় দাও; তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে অথবা প্রকাশ্য বর্ণনা হতে এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? না, বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফেরদের জন্যে তাদের প্রতারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।) [রাদ/৩৩]

সপ্তম এবং অষ্টম প্রমাণ:

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾

(তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।)

এই বাণীতে সৃষ্টির অক্ষমতা এবং তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তাদের খুবই সামান্য জ্ঞান দেয়া হেয়েছে। (তামাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।)[ইসরা/৮৫]

* সে তো প্রথম অবস্থায় মায়ের পেট থেকে বের হয়েছে এমন অবস্থায় যে, তারা কিছুই জানত না। (আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না।) [নাহল /৭৮]

* তাদের জ্ঞান দুর্বল ও ক্ষয়মুখী। (তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় নিকৃষ্টতম বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না।) [নাহ্ল/৭০]

এই জীবনে তারা সম্মুখিন হয় ভূল ও অক্ষমতার। (আমি তো ইতিপূর্বে আদমের (আ) প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভূলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই)। [ত্বাহা/১১৫]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: আদম (আ) ভূলেছিল তাই তারা সন্তানেরাও ভূলে"। তাদেরকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন বলে তারা অর্জন আছে তা, তাদেরকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন বলে তারা অর্জন করেছে। (তারা বলেছিল আপনিপরম পবিত্র; আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তদ্ব্যতীত আমাদের কোনই জ্ঞান নেই।) [বাক্কারাহ/৩২], (যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।) [আ'লাক্ক/৪-৫]

(তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিখিয়েছেন বাক্ প্রণালী।) [রাহমান/৩-৪]

দুআয়ে মাসুরায় উল্লেখ হয়েছে: " হে আল্লাহ আমাকে শিক্ষা দাও তা, যা আমার জন্য লাভদায়ক"। তাই বান্দা জ্ঞানের কোন অংশই অর্জন করতে পারে না কিন্তু যখন আল্লাহ তাকে তাওফীক দেন এবং তার জন্য তা সহজ করেন।

(কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন) এই বাণীতে তাওহীদের আর এক অন্য প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। সব কিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যা চান তা হয় আর যা চান না তা হয় না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি সামর্থ নেই। শাফেয়ী (রাহ:) বলেন:

তুমি যা চাও তা হয় যদিও না চাই আমি।

যা আমি চাই তা হয় না যদি না চাও তুমি।

তুমি বান্দাদের সৃষ্টি করেছ যা তুমি পূর্ব থেকে জ্ঞাত।

তোমার জ্ঞানেই হয় তারূণ্য ও বার্ধক্য।

কারো প্রতি অনুগ্রহ কর, কাউকে কর অপমান।

কাউকে সাহায্য আর কাউকে কর না দান।

তাই কেউ হয় দুর্ভাগা আর কেউ ভাগ্যবান।

আর কেহ হয় অধম কেহ শ্রীমান।

নবম প্রমাণ:

﴿وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ﴾

(তাঁর কুরসী (পাদানি) সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে।)

কুরসী আল্লাহ তা‘আলার বৃহৎ সৃষ্টির একটি। আল্লাহ সুবহানাহু এটির বর্ণনায় বলেন যে, আকাশ এবং যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। তার প্রশস্ততা, আকৃতির বড়ত্বতা এবং ক্ষেত্রের বিশালতার কারণে। ভূমণ্ডল এবং নভোমন্ডলের তুলনা কুরসীর সাথে খুবই ক্ষীণ তুলনা। যেমন কুরসীর তুলনা আরশের সাথে দুর্বল তুলনা। আবূ যর (রা) এর হাদীস এটি বিশ্লেষণ করে। তিনি বলেন: আমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একাকি দেখে তার পাশে বসে পড়ি এবং জিজ্ঞাসা করি: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সর্বোত্তম কোন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়? তিনি বলেন: “আয়াতুল কুরসী; কুরসীর তুলনায় আকাশ এবং যমীন, যেমন মরূভূমিতে পড়ে থাকা একটি বালা (আংটা)। আর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব কুরসীর প্রতি যেমন মরূভূমির শ্রেষ্ঠত্ব সেই বালার প্রতি”। [হিল্‌ইয়াহ, ১/১৬৬, আযামাহ,

২/৬৪৮-৬৪৯, আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৩০০-৩০১, শাইখ আলবানী সহীহ বলেন। সিলসিলা সহীহাহ নং (১০৯)]

হাদীসটি এই আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের স্থানে বর্ণিত হয়েছে যেন, বান্দা এই সৃষ্টির বড়ত্ব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তুলনা করত: তার এবং আকাশ ও যমীনের মাঝে। তারপর তার ও আরশে আযীমের মাঝে তুলনায় উহার ক্ষুদ্র হওয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে।

এখানে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে, মরূভূমিতে পড়ে থাকা ছোট বালার স্থান মরূভুমির তুলনায় কতখানি। (খুবই নগন্য) অনুরূপ কুরসীর অবস্থা আরশের তুলনায়। অতঃপর যমীন আসমানের স্থান কুরসীর তুলনায় সেই রূপ নগন্য।

যদি আপনি চিন্তা করেন এই যমীনের সম্পর্কে যাতে আপনি চলা-ফেরা করেন, বেষ্টনকারী পাহাড়ের তুলনায়। বলুন তো, সাধারণ যমীনের তুলনায় পাহাড়সমূহের স্থান কতখানি। তার পর সমগ্র যমীনের (যমীনের অভ্যন্তর স্তর সহ) তুলনায় তার অবস্থান। তারপর আকশসমূহের তুলনায় এটির স্থান। তারপর কুরসীর তুলনায় এটির স্থান, যে কুরসী আকাশ এবং যমীনকে পরিব্যপ্ত।

তারপর আরশে আযীমের তুলনায় এটির অবস্থান। যেন আপনি অনুভব করতে পারেন বৃত্তের দুষ্প্রাপ্যতা, যাতে আপনি বসবাস করেন। যেন এ চিন্তার মাধ্যমে জানতে পারেন মহান আল্লাহর সৃষ্টির বড়ত্ব যা, স্রষ্টা ও আবিষ্কারকের মহত্ত্বের প্রমাণ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: "তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শণসমূহের সম্পর্কে চিন্তা কর, আল্লাহর সম্পর্কে চিন্তা কর না"। [শারহুল্ ইতেকাদ, লাআল্কায়ী, ২/২১০, শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন। সিলসিলা সহীহ নং ১৭৮৮] এটি বরকতপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা যার দ্বারা বান্দা আবিষ্কারকের মহত্ত্বতা এবং স্রষ্টার পূর্ণতার সঠিক জ্ঞান পায়। জানতে পারে যে, তিনি আল্লাহ সুবহানুহু খুবই বড়, সুউচ্চ এবং সুমহান। এ কারনে কোন কোন পণ্ডিত বলেন: এ স্থানে কুরসীর বর্ণনা, আল্লাহর সুউচ্চতা এবং তাঁর মহত্ত্বতার বর্ণনার উদ্দেশ্যে ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যা, আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ হয়েছে।

মুসলিম ব্যক্তি যখন এই মহত্ত্ব উপলব্ধি করবে, তখন তার রবের সম্মুখে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করবে এবং যাবতীয় ইবদত তাঁর জন্যে করবে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তিনিই ইবাদতের যোগ্য। অন্য কেউ না। জানতে পারবেযে, প্রত্যেক মুশরিক তার রব্বের

যথার্থ সম্মান করে না। যেমন আল্লাহু তা‘আলা বলেন: (তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনা। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাজকৃত তাঁর ডান হাতে। পবিত্রও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে) [যুমার/৬৭] এবং তিনি বেলন: (তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না? অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে, তোমরা লক্ষ্য করনি? আল্লাহ কি ভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলী? এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। তিনি তোমাদের উদ্ভুত করেছেন মাটি হতে। অতঃপর তাতে তিনি তোমদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরূত্থিত করবেন এবং আল্লাহ তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত, যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে। [নূহ/১৩-২০]

জানি না কোথায় গুম হয়ে যায় এই সমস্ত মুশরেকদের বিবেক-বুদ্ধি! যখন তারা তাদের বিনয়-নম্রতা, অসহায়তা-অক্ষমতা, আশা-আকাংখা, ভয়-ভীতি, ভালবাসা এবং কামনা-বাসনা নিবেদন করে, দুর্বল-অক্ষম সৃষ্টির কাছে যারা, নিজের লাভ-লোকসানের মালিক

নয় অপরের মালিক হওয়া তো দুরের কথা, আর বিনয়-নম্রতা নিবেদন করা ছেড়ে দেয় মহান আল্লাহ এবং মর্যাদাবান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। তারা যা বলে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে। তিনি পবিত্র তা থেকে যাকে তারা তাঁর সাথে শরীক করে থাকে।

দশম প্রমাণ:

﴿ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ ﴾

(উভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না।)

এটিও আল্লাহর মাহাত্ম্য এবং তাঁর ক্ষমতা ও শক্তির পূর্ণতার বর্ণনা। আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, কুরআনে না-সূচক কোন কিছু শুধু না হয়না বরং তাতে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণতার প্রমাণ শামিল হয়। তাঁর বাণী: (وَلَا يَـُٔودُهُ) লা-ইয়াউদহু-অর্থাৎ: তাঁকে চিন্তিত করে না, কঠিনে ফেলে না এবং ক্লান্তিও করে না। (হিফ্‌যুহুমা)-উভয়ের সংরক্ষণ- অর্থাৎ: আকাশ এবং যমীনের সংরক্ষণ। এতে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার পূর্ণতার প্রমাণ হয় এবং প্রমাণ হয় যে তিনি সংরক্ষক, আকশমন্ডলী এবং যমীনের সংরক্ষণকারী। যেমন আল্লাহ বলেন: (আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ

করেন যাতে ওরা সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।) [ফাতির/৪১]

তিনি আরো বলেন: (তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি।) [রূম/ ২৫], এতেও আল্লাহর প্রতি সমস্ত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ হয়। তাদের অবস্থান তাঁর নির্দেশে এবং তাদের সংরক্ষণ তাঁর ইচ্ছায়। তাঁর ক্ষমতায় তিনি তাদের ধারক। সৃষ্টি সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর জন্যে ইবাদত আবশ্যিক, তাঁরই উদ্দেশ্যে আনুগত্ব খাঁটি করণ এবং অংশীদার ও শরীক হতে তাঁকে মুক্ত করনের ব্যাপারে এটি উজ্জ্বল প্রমাণ। দুর্বল সৃষ্টি এবং লাঞ্ছিত বান্দা কেমনে তার প্রভূ ও স্রষ্টার সমতুল্য হতে পারে। সংরক্ষিত কেমনি সংরক্ষকের সমতুল্য হতে পারে। সর্ব ক্ষেত্রে অভাবী, পদদলিত কেমনে অভাবমুক্ত প্রসংশিতের সমকক্ষ হতে পারে। তাদের শির্ক থেকে তিনি উর্ধ্বে।

ইবনুল কাইয়্যেম (রা) বলেন: " এটা অজ্ঞতা এবং অত্যাচারের শেষ সীমা। কিভাবে মাটিকে মুনিবদের মুনিবের সাথে তুলনা করা হবে? কিভাবে মাটিকে দাসকে ক্রীতদাসদের মালিকের মত মনে করা হবে? কেমনে দুর্বল, অভাবী সত্তা, ক্ষমতাবান সত্তার বরাবর করা হবে যার, অমুখাপেক্ষীতা, ক্ষমতা, রাজত্ব, তাঁর সত্তার

আবশ্যিকাংশ। এর চেয়ে জঘন্য অত্যাচার আর কি হতে পারে ? অত্যাচারের দিক দিয়ে এর চেয়ে শক্ত বিধান আর কি হতে পারে? যেখানে সমতুল্য করা হয়, আসলে সৃষ্টির মধ্যে যাঁর কোন সমতুল্য নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: (সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্যে যিনি আকশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আলো ও অন্ধকার; তা সত্ত্বেও কাফেররা অপর জিনিসকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ নিরূপন করছে।) [আনআম/১]

মুশরিক, আকাশ ও যমীন, আলো ও অন্ধকার সৃষ্টিকারীর সমকক্ষ করে থাকে তার সাথে যে, আকাশ ও যমীনের অনু পরিমাণেরও কোন কিছুর না নিজে মালিক না অপরের মালিক। হায় অংশী স্থপন। যাতে আছে সর্ব বড় অত্যাচার, সর্ব বড় জঘন্যতা"। [আল্ জাওয়াব আল্ কাফী /১৫৬]

একাদশ এবং দ্বাদশ প্রমাণ:

(তিনি সুউচ্চ, মহীয়ান)

এ দুটি তাওহীদের প্রমাণ। এ মর্মের প্রমাণ যে, তিনি সুবহানাহুই ইবাদাতের হকদার অন্য কেউ নয়। সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তাঁর উচ্চতা

এবং তাঁর মাহাত্ত্বের পূর্ণাঙ্গতার বর্ণনার মাধ্যমে এটি প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী (وَهُوَ الْعَلِيُّ) এর মধ্যে বর্ণিত "আলিফ-লাম" ইস্তিগরাকের (সর্ম্পর্ণ বোধক) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটি উচ্চতা বলতে যা বুঝায়, সেরকম সব অর্থকে শামিল। যেমন, সত্তার উচ্চতা, বিজয়ের উচ্চতা এবং মর্যাদার উচ্চতা। [কবি বলেন:-]

তাঁর জন্য উচ্চতা সর্ব ক্ষেত্রে।

অবস্থান ও সত্তাগত, ক্ষমতাসম্পর্কীয়, মর্যাদার উচ্চতাও বটে। তাই তিনি তাঁর সত্তাসহ উঁচুতে রয়েছেন, সমস্ত সৃষ্টির উর্ধ্বে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: (দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর উঠেছেন।) [ত্বাহা/৫]

তিনি সার্বভৌমত্বের দিক দিয়েও সুউচ্চ, যেমন আল্লাহ বলেন: (তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।) [আনআম/১৮]

তিনি তাঁর সম্মানের দিক দিয়েও সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যেমন আল্লাহ বলেন: (তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না।) [যুমার/৬৭]

এটি তাওহীদের প্রমাণাদির মধ্যে একটি বৃহৎ প্রমাণ এবং শির্কের খণ্ডন। এ কারণে আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন: (এ জন্যেও যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে ওটা তো অসত্য, এবং আল্লাহ, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান।) [আল্ হাজ্জ/৬২]

এবং তাঁর বাণী: (الْعَظِيم) এতে তাঁর মহত্বের প্রমাণ হয় এবং প্রমাণ হয় যে, তাঁর চেয়ে মহান আর কিছূ নেই। এবং প্রমাণ হয় যে, মাখলুকের মর্যাদা যত বড়ই হোক না কেন তা তুচ্ছ এটি হতে যে, তাদের মাহাত্বের তুলনা মহান সৃষ্টিকর্তা এবং অস্তিত্বে আনয়নকারীর মাহাত্বের সাথে করা হবে।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার লুঙ্গি, যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে কোন একটি নেওয়ার চেষ্টা করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব"। [আহমদ, শাইখ আলবানী সহীহ বলেন-নং৫৪০]

এই নামের সাথে সম্পর্কিয় উপাসনাদির মধ্যে হচ্ছে এই যে, বান্দা যেন তাঁর রবের সম্মান করে, তাঁর সামনে হীনতা অবলম্বন করে এবং তাঁর মহান সান্নিধ্যের উদ্দেশ্যে নম্রতা প্রকাশ করে।

বিনয় নম্রতা এবং আনুগত্য কেবল তাঁরই জন্যে করে। কিছু লোককে শয়তান ধোকা দিয়েছে তারা এই সত্যকে বদল দিয়েছে এবং স্পষ্ট শির্কে নিমজ্জিত হয়েছে এবং তাকে আল্লাহর সম্মানের আসনে বসিয়েছে। তারা বলেছে: আল্লাহ তা'আলা মহান মহিয়ান। তাঁর নৈকট্য, মধ্যস্থতাকারী, সুপারিশকারী, নিকটবর্তীকারি উপাস্য ছাড়া লাভ করা যেতে পারে না। আসলে প্রত্যেক বাতিলপন্থী তার বাতেলের প্রচার-প্রসার ঘটাতে পারে না যতক্ষণে না তা সত্যের ছাঁচে পেশ করা হয়।

আবদুর রহমান বিন মাহদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যখন তার কাছে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের কথা বলা হয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলার গুণ সম্পর্কীয় হাদীসগুলিকে অস্বীকার করে এবং বলে: এই ধরনের গুণে গুণাম্বিত করা, আল্লাহ তা'আলা মহান। তিনি বলেন: " এক সম্প্রদায় ধংস হয়েছে সম্মানকে কেন্দ্র করে তারা বলেছে: কিতাব অবতরণ করা কিংবা রাসূল প্রেরণ করা থেকে তিনি উর্ধ্বে।তারপর তিনি পড়েন: (এই লোকেরা আল্লাহ তা'আলার যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি কেননা, তারা বললো: আল্লাহ কোন মানুষের উপলব্ধি করেনি কেননা, তারা বললো: আল্লাহ কোন মানুষের উপর কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি।) [আন্

আম /৯১], তারপর বলেন: অগ্নিপুজকরা তো সম্মানকে কেন্দ্র করেই ধ্বংস হয়েছে। তারা বলে: আল্লাহ মহান এটি থেকে যে আমরা তাঁর ইবাদত করব বরং আমরা ইবাদত করব তার যে আমাদের চেয়ে আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী। তাই তারা সূর্যের ইবাদত করে এবং সিজদা করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন: (যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে (তারা বলে:) আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।)" [যুমার/৩] [আল্ হুজ্জাহ, তায়মী-১/৪৪০]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সম্বন্ধে এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা যা তাদেরকে আল্লাহর সাথে শির্ক এবং অংশী স্থাপনে লিপ্ত করেছে। তারা মনে করছে এ দ্বারা তারা রাব্বুল আলামীনের সম্মানই করছে। তাদের প্রভূর সম্পর্কে তারা যদি ভাল ধারণা রাখত তাহলে, তারা তাঁকে একক মনে করার মত মনে করত।

[একটি মহান মূল নীতি]

ইবনুল কাইয়্যেম (রহ:) বলেন: " এটির বর্ণনার পর এখানে এক মূল নীতি পাওয়া যায় যা, বিষয়বস্তুর সহস্য উদঘাটন করে আর

তা হল; আল্লাহর নিকট সব চেয়ে বড় গুনাহ হল: তাঁর সম্পর্কে কুধারণা রাখা। কারণ কুধারণা পোষণকারী তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা রাখে যা, তাঁর উত্তম নামসমূহ এবং গুণাবলীর বরখেলাফ। একারণে আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে কুধারণা পোষণকারীদের ক্ষেত্রে করেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: (অমঙ্গল চক্র তাদের জন্যে, আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন আর তাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; ওটা কত নিকৃষ্ট আবাস!) [আল্ ফাত্হ/৬] তাঁর কোন গুণ অস্বীকারকারীর সম্পর্কে বলেন: (তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্থ।) [ফুস্সিলাত/২৩], আল্লাহ তাঁর খলীল ইব্রাহীম (আ:) সম্পর্কে বলেন, তিনি তাঁর গোত্রকে বলেন: তোমরা কিসের পূজা করছ? তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মিথ্যা মা'বুদগুলোকে চাও? জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?) [স্বাফ্ফাত/৮৫-৮৭], অর্থাৎ: অন্যের ইবাদত করার পর তোমাদের কি মনে হয়? তোমাদের আল্লাহ কি বদলা দিতে পারেন যখন তোরমা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে? তাঁর নামাবলী, গুণাবলী এবং রুবুবিয়্যাতের সম্বন্ধে তোমাদের যে কমতি সম্পন্ন ধারণা যা,

তোমাদের অন্যের দাসত্বমুখী করেছে। এর ফলে তোমাদের তিনি কি বদলা দিতে পারেন?

যদি তোমরা তাঁর সম্পর্কে সে ধারণা রাখতে যার তিনি অধিকারী তো কতই না ভাল হত যে, তিনি সব কিছুর ব্যাপারে জ্ঞাত, সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি ব্যতীত সব কিছু হতে তিনি অমুখাপেক্ষী, আর সব কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি ন্যায়বিচারক। সৃষ্টিকে পরিচালনার ব্যাপারে তিনি একক এ ক্ষেত্রে তাঁর কেউ অংশী নেই। পুংখানুপুংখ বিষয়াদির জ্ঞানী তাই সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর কাছে অস্পষ্ট নয়। তিনি একাই তাদের জন্য যথেষ্ট তাই কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর সত্তাসহ পরম করুণাময় তাই দয়া করার ব্যাপারে তিনি কারো সহানুভূতির প্রয়োজন মনে করেন না। এটা রাজাগণ এবং অন্যান্য শাসকদের বিপরীত কারণ তারা মুখাপেক্ষী এমন লোকের যারা, তাদের প্রজাদের অবস্থা এবং সমস্যার সম্পর্কে অবগত করাবে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবে। মুখাপেক্ষী এমন লোকের যে, তাদের সুপারিশের মাধ্যমে দয়া প্রার্থী এবং সহানুভূতির তলবকারী হবে। এ কারণে তাদের মাধ্যমের প্রয়োজন হয়েছে তাদের সমস্যা, দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং তাদের জ্ঞানে

স্বল্পতার কারণে। আর যিনি সব কিছুর প্রতি ক্ষমতাবান, সব কিছু হতে অমুখাপেক্ষী, সব কিছুর প্রতি ক্ষমতাবান, সব কিছু হতে অমুখাপেক্ষী, সব কিছুর ব্যাপারে জ্ঞানী, পরম করুণাময় দয়ালু, যার দয়া সব কিছুকে শামিল। এ রকম গুণে গুণান্বিত সত্তা এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম স্থাপন করা আসলে তাঁর রুবুবিয়্যাত (প্রভু-সম্বন্ধীয়) উলুহিয়্যাত (ইবাদত-সংক্রান্ত) এবং একত্ব সম্পর্কীয় ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা ছোট করা এবং তাঁর সম্পর্কে কুধারণা রাখা ছাড়া আর কি। এটি কখনও তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে বৈধ করেন নি। সুবিবেক এবং সু স্বভাবও এর বৈধতা অস্বীকার করে। আর এর জঘন্যতা সুবিবেকে সমস্ত জঘন্যতার উর্ধ্বে বিদ্যমান।

এর বিশ্লেষণ এইরূপ: অবশ্যই উপাসনাকারী তাঁর উপাস্যকে সম্মান করে, উপাস্যের মর্যাদা দেয় এবং তাঁর জন্যে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে মহান রব্ই একক ভাবে পূর্ণ সম্মান, মর্যাদা, ভালবাসা এবং বিনম্র-বিনয়ীর হকদার। এটা তাঁর একচ্ছত্র হক। তাই তাঁর হোক অন্যকে দেওয়া অথবা তাঁর হকের মাঝে অন্যকে অংশী করা জঘন্য অত্যাচার। বিশেষ করে তাঁর হকে শরীককৃত ব্যক্তি যদি তাঁর বান্দা এব দাস হয় তাহলে তা হবে

আরো জঘন্য। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন: (আল্লাহ তোমদের জন্যে তোমদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন: তোমাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার? ফলে তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শণাবলী বর্ণনা করি।) [রূম/২৮], অর্থাৎ: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অপছন্দ মনে করে যে, তার দাস তার সম্পদে অংশী হোক তাহলে, আমার দাসদের কাউকে আমার অংশী কেমনে করে থাকি যে বিষয়ে আমি একক? আর তা হচ্ছে উপাস্য মনে করা যা, আমি ব্যতীত অন্যের জন্যে অসমীচীন, আমি ছাড়া অন্যের জন্য অশুদ্ধ।

যে এমন ধারণা রাখে সে আমার যথোচিত মর্যাদা দিল না, যথাযথ সম্মান করল না, আমাকে একক মনে করলো না যে বিষয়ে আমি একক কোন সৃষ্টি না। সে যথাযথ আল্লাহর সম্মান করলো না যে, আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদত করলো। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন: (হে লোক সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি

করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও পারবে না; এবং মাছি যদি সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে, এটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না; পূজারী ও দেবতা কতই না দুর্বল! তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা দেয় না; আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।) [হাজ্জ/৭৩-৭৪]

তাই সে আল্লাহর যথাযথ সম্মান করলো না যে ব্যক্তি তাঁর সাথে এমন অন্যের ইবাদত করলে যে, অতি দুর্বল এবং অতি ছোট প্রাণী সৃষ্টি করতে অক্ষম এবং তার নিকট হতে যদি মাছি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাও উদ্ধার করতে অক্ষম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: (তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে ভাজকৃত তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।) [যুমার/৬৭], যাঁর এই মহীমা ও মহত্ব তাঁর সে যথাযথ সম্মান করে না যে তাঁর ইবাদতে অন্য এমন কাউকে শরীক করে যার এতে কোন কখনই অংশ নেই বরং সে সবচেয়ে দুর্বল এবং অক্ষম। তাই সে শক্তিশালী ক্ষমতাবান আল্লাহর যথাযথ সম্মান

করলো না যে, দুর্বল পদদলিতকে তাঁর সাথে শরীক করলো”। [আল্ জাওয়াব আলকাফী/ ১৬২-১৬৪]

***

[উপসংহার]

তাওহীদের এটি ১২টি প্রমাণ যা, এই মহান আয়াতে তাওহীদের প্রমাণার্থে এবং এমর্মের বিশ্লেষণার্থে বর্ণিত হয়েছে যে, অবশ্যই এক আল্লাহই উপাসনার ক্ষেত্রে একক, ইবাদতের হকদার আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং তিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ হবে, সে যেন দিবা-রাতে এ আয়াতস্থলে গবেষণামূলক চিন্তা-ভাবনাকরত: তাওহীদ ও ইখলাসকে কেন্দ্র করে যা বর্ণিত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করত: আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক ও অংশী করা থেকে মুক্ত করত: এবং মহান রবের উদ্দেশ্যে তাঁর সুন্দর নামাবলী এবং মাহান গুণাবলী প্রমাণ করত: অবস্থান করে। এই আয়াতে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার পাঁচটি সুন্দর নাম এবং কুড়িটিরও অধিক গুণের বর্ণনা হয়েছে যা, মহান রাব্বের পূর্ণঙ্গতা, তাঁর মাহাত্ম্য, মার্যাদা, সৌন্দর্যতা এবং মহিমা প্রমাণ করে। যাঁর জন্যে চেহারা অবনত,

আওয়াজ বিনম্র, তাঁর ভয়ে অন্তর শঙ্কিত এবং গর্দানসমূহ অনুগত। তিনি আল্লাহ মহান দুই জাহানের রব। এই আয়াতের সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কতই না মহত্ত লাভ এবং অঢেল কল্যাণ নিহিত।

[আন্তরিক আহ্বান]

আমি এ স্থানে বলতে চাই, এই আয়াতটির সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে এবং আয়াতটি যা প্রমাণ করে তা উপলব্ধি করা থেকে সেই সমস্ত লোকদের বিবেক কোথায় গুম হয়ে যায় যারা এ আয়াত অধ্যায়ন করে। যারা কবরের সম্মান, সেখানে অবস্থান এবং বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করার ব্যাধিতে লিপ্ত। যারা কবরবাসীর উদ্দেশ্যে নযরানা-উপঢৌকন পেশ করে, সেখানে কুরবানী দেয়, প্রয়োজন কামনায় সেদিকে মনোযোগ দেয় এবং তাদের এমন সম্মান দেয় যা আকাশ যমীনের রব্ব ছাড়া অন্যের জন্যে একেবারে অনুচিত। যে ব্যক্তি কবরের নিকট তাদের এ সমস্ত কার্য-কলাপ দেখবে সে আশ্চার্য জিনিস দেখতে পবে। ইবনুল কাইয়্যূম (রাহ:) বলেন: "যদি আপনি অতিরঞ্জনকারীদের দেখেন যারা কবরের নিকট মেলা লাগায়, তো দেখতে পাবেন তারা গাড়ি-ঘোড়া থেকে অবতরণ করে, যখন দুর থেকে সে স্থান

দেখতে পায়। অতঃপর তাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কপাল ঠেকায় (সাজদা করে), মাটি চুম্বন করে, মাথা খোলে, শোরগোল করে, এক অপরকে দেখাদেখি করে কাঁদে যার ফলে ক্রন্দনের আওয়াজ শোনা যায় এবং মনে করে তারা হজ্জের চেয়েও অধিক নেকী অর্জন করেছে। তাই তারা তার কাছে ফরিয়াদ জানায় যে, না অস্তিত্বদান করতে সক্ষম আর না পুনরাবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তাদের আহব্বান জানান হয় কিন্তু যেন বহু দুর হতে। তারপর যখন নিকটস্থ হয় তখন কবরের কাছে দুই রাকাআত নামায পড়ে। এরপর মনে করে তারা নেকীর ভান্ডার সংরক্ষণ করেছে। আর যে দুই কিবলার দিকে নামায পড়েছে সে কোন সওয়াব অর্জন করেনি। তাদের দেখতে পাবেন কবরের চতুর্পার্শে রুকু এবং সিজদারত অবস্থায়, মৃত্যুর কৃপা এবং সন্তুষ্টি অণ্বেষণ করতে। আসলে তাদের হাতে লাগে নিরাশা এবং ব্যর্থতা। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে বরং শয়তানের জন্যে সেথায় অশ্রু ঝরানো হয়। কণ্ঠ উচ্চিত হয়। মৃত্যুর নিকট প্রয়োজন চাওয়া হয়, বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া হয়, দরিদ্রদূরীকরণের প্রার্থনা করা হয় এবং অসুস্থতা হতে সুস্থতা কামনা করা হয়। তার পর দেখবেন কবেরের চতুর্পার্শে তাওয়াফে মনযোগ দিতে যেন, তা বায়তুল হারাম যাকে আল্লাহ করেছেন বরকতপূর্ণ এবং দুইজাহানের জন্য

হিদায়েত স্বরূপ। তার পর চুম্বন এবং বরকতের স্পর্শ করণ। আপনি কি হাজরে আসওয়াদকে দেখেছেন উহার সাথে বায়তুল হারামের অতিথিরা কি করে? (অনুরূপ করা হয়) তার পর সেখানে মাটিতে ঘর্ষণ করা হয় সেই সমস্ত কপাল ও গাল যা, আল্লাহ জানেন যে তাঁর দরবারে সেজদার সময় অনুরূপ ঘর্ষণ করা হয়না। অতঃপর তারা কবরের হজ্জ পূর্ণ করে চুল চেঁছে ও ছেঁটে। সেই মূর্তি থেকে পাওয়া অংশ দ্বারা তারা উপকৃত হতে চায় আসলে আল্লাহর কাছে যাদের কোন অংশ নেই। সেই প্রতিমার উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করে। আসলে তাদের নামায, তাদের উপঢৌকন ও কুরবানী হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে। আপনি তাদের দেখবেন এক অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে, তারা বলে: আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে অধিক ও উত্তম বদলা দিন ! আর যখন তারা দেশে ফিরে তখন অনুপস্থিত অতিরঞ্জণকারীরা আবেদন করে, তোমাদের কেউ আছে কি যে কবরের হজ্জকে বায়তুল্লাহর হজ্জের বিনিময়ে বদল করবে? উত্তরে বলা হয়: না, তোমার প্রতি বছরের হজ্জের বিনিময়েও না !!!

এটি সংক্ষিপ্ত আমরা তাদের ব্যাপারে বাড়তি কিছু বলি নি, আর না তাদের সমস্ত বিদ‘আত ও ভ্রষ্টতার পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছি। আসলে সেগুলো তো বিবেক ও কল্পনার বাইরে।” [ইগাসাতুল্ লাহফান, ১/২১৩]

এই সমস্ত বিপথগামী পথভ্রষ্টদের আক্কেল কোথায় হারিয়ে গেছে ! কি আশ্চার্য ! তারা ফিরে চলেছে নিজেদের মত বান্দাদের ইবাদত তথা সম্মানের দিকে আর মহান প্রতিপালকের বান্দাদের ইবাদত তথা সম্মানের দিকে আর মহান প্রতি পালকের ইবাদত ছেড়ে বসেছে। অথচ আল্লাহ বলেন: (আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে।) [আ’রাফ/১৯৪] তারা আল্লাহর সম্পর্কে যা বলে তা থেকে তিনি পবিত্র এবং যা শির্ক করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে।

এই প্রকার লোকদের জন্য এবং অন্যান্যদের জন্য, এই মহৎ আয়াতটির অধ্যায়ন এবং এর মহান প্রমাণাদির সম্বদন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশ্যে, এই পুস্তিকাটি একটি আহবান। অতঃপর তাওহীদ ও ইখলাস সম্পর্কীয় বর্ণিত বিধি-বিধান বাস্তবায়ন এবং

উহার স্পষ্ট প্রমাণাদি এবং উজ্জ্বল দলিলাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে শির্ক ও অংশী হতে মুক্ত করণের ডাক।

হে আল্লাহ ! তোমার হেদায়েতের তাওফীক দান করো ! আমাদের আমলকে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করো ! কথা ও কাজে ইখলাস দাও ! তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী, তুমিই আশার অধিকারী, তুমিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং অতি উত্তম প্রতিনিধি। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সহচরগণের প্রতি বর্ষিত হউক রহমত, অনুকম্পা এবং শান্তি।